গল্পে হযরত উসমান (রা)
ইকবাল কবীর মোহন

গল্পে হযরত উসমান (রা)

ইকবাল কবীর মোহন

গল্পে হযরত উসমান (রা)

ইকবাল কবীর মোহন

গল্পে হযরত উসমান (রা)

ইকবাল কবীর মোহন

প্রকাশনায়	নার্গিস মুনিরা, শিশু কানন ৩০৭ পশ্চিম রামপুরা, ঢাকা ফোন : ০১৭১০ ৩৩০৪৩০
প্রকাশকাল	আগস্ট ২০১১
ছাপা	সফিক প্রেস
প্রচ্ছদ	মুবাশ্বির মজুমদার
মূল্য	৬৪.০০ টাকা মাত্র

The Story of Hazrat Osman (R)

Iqbal Kabir Mohon, Published by Shishu Kanon

Price : Taka 64.00
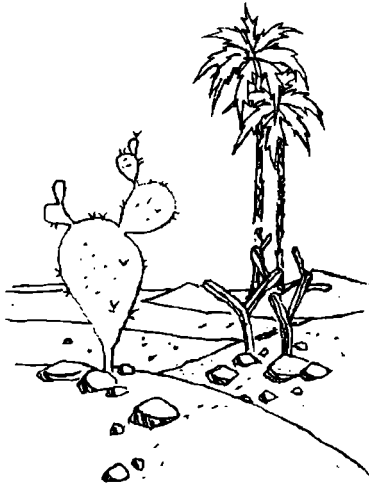
বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

ভূ মি কা

ইসলাম আল্লাহর মনোনীত একমাত্র জীবনবিধান। দুনিয়ার সেরা নবী হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর মাধ্যমে ইসলাম পূর্ণাঙ্গতা লাভ করেছে। আমাদের প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ (সা) এই শ্রেষ্ঠ বিধানকে সফলভাবে দুনিয়ায় কায়েম করে গেছেন। এ জন্য তাঁকে অনেক অনেক দুঃখ-কষ্ট ও অত্যাচার-নিপীড়ন সহ্য করতে হয়েছে। মহানবী (সা)-এর প্রিয় সাহাবীরাও ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য কম চেষ্টা করেননি। তাঁদের সবার চেষ্টা-প্রচেষ্টার ফলে ইসলাম দুনিয়ার নানা প্রান্তে ছড়িয়ে পড়েছিল। তাই সাহাবীরাও সবার কাছে সমাদৃত ও সম্মানিত।

এসব সাহাবীর মধ্যে ইসলামের চার খলিফা ছিলেন অন্যতম। তাঁদের বিশাল ব্যক্তিত্ব এবং গুণাবলি এখনও আমাদের কাছে আলোর দিশা হয়ে আছে। তাই এ চারজন বিশিষ্ট খলিফার জীবন ও কর্ম জানা থাকা আমাদের প্রয়োজন। আজকের দুনিয়ার চরম ও সীমাহীন নৈতিক অধঃপতনের যুগে প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর জীবনের নানা দিক যেমন আলোচনা করা প্রয়োজন, তার পাশাপাশি চার খলিফার জীবনকেও অনুধাবন করা প্রয়োজন। বিশেষ করে আমাদের শিশু-কিশোরদের সামনে তাঁদের চরিত্রমাধুর্যের চিত্র তুলে ধরা খুবই জরুরি। এর ফলে আমাদের শিশু-কিশোররা অনেক কিছু শিখতে পারবে এবং এই শিক্ষার আলোকে তাদের জীবনকে সুন্দরভাবে গড়ে তোলার সুযোগ পাবে।

'গল্পে হযরত উসমান (রা)' বইটিতে ইসলামের তৃতীয় খলিফার জীবনের সামান্য কিছু দিক তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। আমি মনে করি, আমাদের সোনামণি শিশু-কিশোররা বইটি পড়ে আমাদের প্রিয় খলিফার জীবন ও চরিত্র হৃদয়ঙ্গম করতে সক্ষম হবে। এতে তাদের জীবন হবে সর্বাঙ্গীণ সুন্দর ও পবিত্র। বড়রাও এ বই থেকে অনেক কিছু জানতে পারবেন বলে আমার বিশ্বাস। আল্লাহ আমাদের এ নগণ্য প্রচেষ্টাকে কবুল করুন। আমিন।

ইকবাল কবীর মোহন
৩০৭ রামপুরা, ঢাকা-১২১৯
ফোন : ০১৭১৩-২২৯৯২৫

মদীনার বালু বক্ষ দীর্ণ করি তোমারই সে দান
এল নিয়ে প্রাণ-ধারা অফুরন্ত পানীয় সন্ধান
মসজিদে মিনার ওঠে, দূরাচারী পথিকেরা আসে
মরণসঙ্কুল মাঠে স্বপ্ন দেখে নিশ্চিত বিশ্বাস
সেই সত্য প্রতিষ্ঠার দিনে
বিশাল ভাণ্ডার তব ঈমানের পথ নিল চিনে
করে গেলে সীমাহীন দান
বিশাল বিশ্বের বুকে চিরস্থায়ী করে গেলে
মানুষের বিপুল সম্মান।

-ফররুখ আহমদ

গল্পে হযরত উসমান (রা)
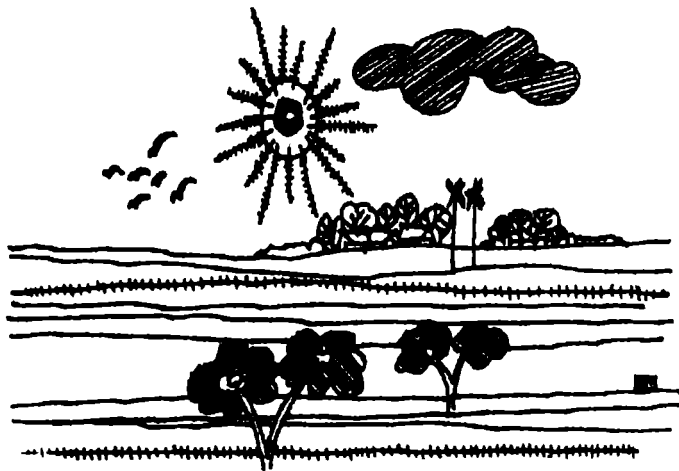
উসমান (রা) এলেন দুনিয়ায়

অনেক অনেক দিন আগের কথা। গোটা আরবদেশ তখন ঘোর অন্ধকারে ডুবে ছিল। পাপাচার, অনাচার ও খুন-খারাবি সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ঢুকে পড়েছিল। দীন-ধর্ম ভুলে গিয়ে আরবের অধিকাংশ মানুষ মারামারি ও কাটাকাটিতে লিপ্ত থাকত। ইসলামের নবী হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর বয়স তখন মাত্র ছয় বছর। প্রাণপ্রিয় মা আমিনাকে হারিয়ে আমাদের প্রিয়নবী মুহাম্মদ (সা) সবেমাত্র এতিম হয়ে পড়েছেন। জন্মের ছয় বছর আগে তিনি বাবাকেও হারিয়ে ছিলেন।

এমনি এক দুর্যোগময় সময়ে হযরত উসমান (রা) দুনিয়ায় এলেন। সেটা ৫৭৬ খ্রিষ্টাব্দের কথা। মক্কার বিখ্যাত কুরাইশ বংশের এক গোত্রের নাম উমাইয়া। সে গোত্রে হযরত উসমান (রা) জন্মগ্রহণ করেন।

উসমান (রা)-এর মায়ের নাম মা আরওয়া বিনতে কুরাইয়েয। তাঁরই কোল পরিপূর্ণ করে দুনিয়ায় এলেন ফুটফুটে শিশু উসমান (রা)। নাদুস-নুদুস শিশু উসমানকে পেয়ে মায়ের বুক অনাবিল আনন্দে ভরে উঠল। বাবা আফফান ইবনে আবুল আস। তিনিও সুন্দর শিশু পুত্রের আগমনে যারপরনাই খুশি

হলেন। মা আরওয়া ও বাবা আফফান মিলে পুত্রের নাম রাখলেন উসমান। তাঁর পুরো নাম উসমান ইবনে আফফান (রা)।

হযরত উসমান (রা)-এর ছেলেবেলা সম্পর্কে বিস্তারিত তেমন কিছু জানা যায় না। তবে ছেলেবেলায় উসমান (রা) সমাজের আর দশটা ছেলেপেলের মতো ছিলেন না। তিনি ছিলেন সবার চেয়ে আলাদা প্রকৃতির।

ছোটবেলা থেকে তিনি বেশ ভদ্র ও নম্র বালক হিসেবে সবার কাছে পরিচিত ছিলেন। তাঁর স্বভাব চরিত্র ছিল অনুপম সৌন্দর্যে ভরপুর। আরবের অধিকাংশ মানুষ যখন পাপ-পঙ্কিলতা ও অনাচারে লিপ্ত ছিল তখন উসমান (রা) এসব খারাবি থেকে ছিলেন মুক্ত। সমাজের পাপ ও অনাচার তাঁকে মোটেও স্পর্শ করতে পারেনি।

সে সময় দুনিয়ায় আজকালকের মতো শিক্ষার মোটেও সুযোগ ছিল না। তখন না ছিল স্বীকৃত কোনো মক্তব, না ছিল মাদরাসা কিংবা স্কুল বা বিদ্যালয়। তাই উসমান (রা) প্রাতিষ্ঠানিক লেখাপড়া করার সুযোগ পাননি। তখনকার যুগে এমন কোনো ব্যবস্থা কল্পনা করা যেত না।

তবে আরবে তখন বেশ কিছু অনানুষ্ঠানিক শিক্ষার প্রচলন ছিল। তার মধ্যে কুষ্টিবিদ্যা ও কুস্তিবিদ্যা ছিল অন্যতম। নিজের চেষ্টা ও আগ্রহে উসমান (রা) এসব বিদ্যা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তিনি কুষ্টিবিদ্যায় অত্যন্ত পারদর্শী ছিলেন। উসমান (রা)-কে কুরাইশ বংশের অন্যতম কুষ্টিবিদ্যা বিশারদ বলে সবাই জানত। কুরাইশদের অতীত ইতিহাস সম্পর্কেও তাঁর জ্ঞান ছিল অসাধারণ।

উসমান (রা)-এর জ্ঞান, বুদ্ধি ও ভদ্রতার জন্য লোকেরা তাঁকে খুব ভালোবাসত। লোকেরা তাঁকে বেশ মর্যাদাও দিত। ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার পর উসমান (রা)-এর সামনে জ্ঞানের নব দিগন্ত খুলে গেল। এ জ্ঞান ছিল ঐশী ভাণ্ডার থেকে উৎসারিত। এ জ্ঞান ছিল পবিত্র কুরআন ও হাদিসের জ্ঞান। হযরত উসমান (রা) ক্রমেই কুরআন ও হাদিসের ওপর প্রভূত জ্ঞান আহরণের সুযোগ লাভ করেন। আর এ জ্ঞানকে ধারণ করেই তিনি বিখ্যাত হয়ে উঠেন।

ছোটবেলা থেকে হযরত উসমান (রা) ছিলেন অতুলনীয় সুন্দর। তিনি অনুপম স্বাস্থ্যের অধিকারী ছিলেন। তাঁর দৈহিক গঠন ছিল অসাধারণ। যে কেউ তাঁকে দেখে অবাক হয়ে তাঁর দিকে তাকিয়ে থাকত। তিনি শুধু

অতুলনীয় সুন্দরই ছিলেন না, চরিত্র গুণেও উসমান (রা)-এর মতো মানুষ আরবে খুঁজে পাওয়া কষ্টকর ছিল। তাঁর মন ছিল প্রস্ফুটিত ফুলের মতো অনাবিল পবিত্র। তিনি অতি ভদ্র ও নরম মানুষ ছিলেন। সবার সাথে তিনি নরম ভাষায় কথাবার্তা বলতেন। যে কেউ তাঁর স্পর্শে এলে আচার-ব্যবহারে মোহিত না হয়ে পারত না।

উসমান (রা)-এর এ সুন্দর আচরণ তাঁকে মর্যাদার সর্বোচ্চ শিখরে তুলে দিয়েছিল। ফলে একদিন এ মানুষটিই মুসলিম জাহানের কর্ণধার হিসেবে পরিচিতি লাভ করলেন। ইসলামের তৃতীয় খলিফা নির্বাচিত হয়ে উসমান (রা) বিস্ময়ের সৃষ্টি করলেন।

ব ল তে পা রো ?

১. হযরত উসমান (রা) কখন কোন বংশে জন্মগ্রহণ করেন?

২. তাঁর পিতা ও মাতার নাম কী ছিল?

৩. উসমান (রা) রাসূল (সা)-এর কত বছরের ছোট ছিলেন?

৪. তিনি কোন কোন বিষয়ে পারদর্শী ছিলেন?

উসমান (রা) মুসলমান হলেন

শিশু উসমান ধীরে ধীরে বড় হলেন। একদিন তিনি শৈশব ও কৈশোর পেরিয়ে পরিণত বয়সে উত্তীর্ণ হলেন। তাঁর অপূর্ব চরিত্র সুষমার কারণে সমাজের মধ্যে তাঁর আলাদা একটি ভাবমূর্তি গড়ে উঠল।

দেখতে দেখতে হযরত উসমান (রা)-এর বয়স তিরিশের কোটায় এসে উপনীত হলো। উসমান (রা)-এর পারিবারিক ঐতিহ্য ছিল ব্যবসা-বাণিজ্য। ফলে দেখতে দেখতে তিনিও নিজেকে পারিবারিক ব্যবসা বাণিজ্যের সাথে জড়িয়ে ফেললেন। প্রায়শই তিনি ব্যবসার কাজে খুব ব্যস্ত থাকতেন।

উমসান (রা) ছিলেন বেশ ভাগ্যবান মানুষ। তাঁর হাতে পড়ে পারিবারিক ব্যবসায় প্রভূত উন্নতি সাধিত হলো। তাঁর তত্ত্বাবধানে অতি দ্রুত গতিতে ব্যবসা বেশ প্রসার লাভ করল। তাই অল্পদিনের মধ্যেই হযরত উসমান (রা) আরবের একজন বড় ব্যবসায়ী হিসেবে পরিচিতি লাভ করলেন। ফলে উসমান (রা)-এর হাতে অফুরন্ত ধন সম্পদ এসে জমা হলো। দেখতে দেখতে উসমান (রা) আরবের একজন সেরা ধনী লোকে পরিণত হলেন। অঢেল ধন-সম্পদের কারণে লোকজন তাঁকে 'গনি' বলে ডাকত। 'গনি' অর্থ

ধনী। বিশাল ধন-সম্পদ আর বিত্তের মালিক হলে কী হবে? এসব ধন-সম্পদ ও বিত্ত নিয়ে উসমান (রা)-এর কোনো ভাবনা ছিল না। সম্পদ নিয়ে তাঁর মনে কোনো গর্ব-অহঙ্কারও ছিল না। মজার ব্যাপার হলো, উসমান (রা)-এর মধ্যে ভোগ-বিলাসের নেশাও ছিল না।

ফলে ধন-সম্পদকে তিনি সব সময় ভালো ভালো কাজে লাগানোর চেষ্টা করতেন। তিনি খারাপ কাজকে প্রাণভরে ঘৃণা করতেন। তাই উসমান (রা)-এর ধন-সম্পদে সমাজের মানুষ উপকৃত হতো। তিনি সমাজের কল্যাণে এবং অভাবি মানুষের প্রয়োজনে তাঁর সম্পদকে অকাতরে বিলিয়ে দিতেন।

উসমান (রা) তখনও ইসলাম গ্রহণ করেননি। মুসলমান না হলে কী হবে, তাঁর মন অন্যান্য মানুষের মতো পঙ্কিল ছিল না। তিনি সব সময় সত্য, সুন্দর ও ন্যায় কাজের কথা ভাবতেন। সত্য ও সুন্দরের জন্য আগে থেকেই তাঁর মন উতলা হয়ে থাকত।

তাই তিনি যখন ইসলামের সত্যবাণী শুনতে পেলেন, তখনই তার প্রতি আগ্রহী হয়ে উঠলেন। সত্যকে জানার সাথে সাথে তিনি তা সহজে গ্রহণ করে নিলেন এবং সত্য ধর্ম ইসলামকে মেনে নিলেন।

হযরত উসমান (রা)-এর ইসলাম গ্রহণ বিষয়ে নানা মতভেদ রয়েছে। ঠিক কিভাবে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন তা নিয়ে বিভিন্ন তথ্য পাওয়া যায়। কেউ কেউ বলেন, তিনি তাঁর এক খালার অনুপ্রেরণায় ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। খালার নাম ছিল সুদা। জানা যায়, সুদা একজন বিশিষ্ট ভবিষ্যৎ বক্তা হিসেবে বেশ পরিচিত ছিলেন। তিনি মহানবী (সা)-এর আগমন সম্পর্কে অনেক কিছুই জানতেন। খালা সুদা এসব বিষয় উসমান (রা)-কে অবগত করান। তিনি উসমান (রা)-কে জানালেন যে, মুহাম্মদ (সা) আল্লাহর পয়গম্বর। তিনি সত্য দীন নিয়ে দুনিয়ায় এসেছেন। সুদার কাছে মহানবী (সা)-এর সত্য দীন সম্পর্কে জানার পর উসমান (রা) আর বসে থাকলেন না। তিনি নবীজির প্রতি ঈমান এনে মুসলমান হয়ে গেলেন।

কারো কারো মতে, উমসান (রা)-এর ইসলাম গ্রহণের ঘটনাটি ছিল ভিন্ন। উসমান (রা) বড় ব্যবসায়ী হওয়ার কারণে ব্যবসার কাজে তাঁকে বিভিন্ন দেশে যেতে হতো। একদা ব্যবসার কাজে উসমান (রা) সিরিয়া সফর করছিলেন। এ সময় একদিন বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। এক ফাঁকে তাঁর চোখে ঘুম নেমে এলো। ঘুমের মধ্যে তিনি স্বপ্নে দেখলেন, কে একজন এসে

বলছেন, 'ওহে ঘুমন্ত ব্যক্তি, তাড়াতাড়ি কর। 'আহমদ' নামে একজন রাসূল মক্কায় আত্মপ্রকাশ করেছেন।'

তখন উসমান (রা) তাঁর এ স্বপ্নের তাৎপর্য ঠিক বুঝতে পারেননি। তবে এ ঘটনা তাঁর মনের মধ্যে চাঞ্চল্য ও গভীর ভাবের সৃষ্টি করল। তিনি এ অভাবিত স্বপ্ন নিয়ে বেশ ভাবনায় পড়ে গেলেন। সময়ের ফাঁকে ফাঁকে উসমান (রা) স্বপ্নের বিষয়টি নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করেন। কিন্তু কোনো কূল-কিনারা করতে পারেন না। তিনি ভাবেন, কে এ আহমদ, কেন তাঁর জন্য তাড়াতাড়ি করতে হবে?– এ ভাবনা তাঁকে সবসময় তাড়িয়ে বেড়াচ্ছিল।

স্বপ্ন দেখার পর থেকে উসমান (রা) তাঁর ব্যবসায় মন বসাতে পারছিলেন না। তাই তিনি দ্রুত সিরিয়া থেকে মক্কায় তাঁর বাড়িতে ফিরে এলেন। এসেই তিনি শুনতে পেলেন এক মহামানবের কথা। নাম তাঁর মুহাম্মদ (সা)। তিনি জানতে পারলেন, মুহাম্মদ (সা) গোপনে মানুষকে ইসলামের দাওয়াত দিচ্ছেন। তিনি শুনতে পেলেন মুহাম্মদ (সা) আল্লাহর নবী। তিনি এক আল্লাহর দীন প্রচার করছেন। মুহাম্মদ (সা) মক্কার মানুষকে সৎপথে চলতে বলছেন, দেব-দেবীর উপাসনা ও মূর্তি পূজা ত্যাগ করার পরামর্শ দিচ্ছেন এবং এক আল্লাহর ইবাদাত করতে উপদেশ দিচ্ছেন। সবাইকে তিনি মিথ্যা, অন্যায় ও অবিচারের পথ ছেড়ে সত্যের পথে চলার আহ্বান জানাচ্ছেন। উসমান (রা) এটাও জানতে পারলেন যে, কেউ কেউ মুহাম্মদ (সা)-এর দীন গ্রহণ করেছেন। আবার কেউ কেউ তাঁর দীনকে অস্বীকার করছে। তারা কেউ কেউ মুহাম্মদ (সা)-কে তিরস্কারও করছে। যারা মহানবী (সা)-কে মানছে না, তারা যে ভালো লোক নয়, তাও হযরত উসমান (রা)-এর কানে এলো।

এসব কথাবার্তা শুনে উসমান (রা)-এর সিরিয়ার সেই স্বপ্নের কথা মনে পড়ে গেল। ফলে তাঁর মনে প্রচণ্ড তোলপাড় শুরু হলো। তিনি কিছুতেই আর স্থির থাকতে পারলেন না। তাঁর মন যেন উতলা হয়ে উঠল। উসমান (রা)-এর ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের একজন হলেন হযরত আবু বকর (রা)। দু'জনের মধ্যে বেশ খায়-খাতির ছিল। তারা সময়ে-অসময়ে নানা বিষয় নিয়ে আলাপ আলোচনা করেন, বুদ্ধি পরামর্শ করেন।

কখনও প্রয়োজন হলে উসমান (রা) ছুটে যান বন্ধু আবু বকর (রা)-এর পরামর্শ নিতে। আজ এ অস্থিরতার মধ্যে বন্ধু আবু বকর (রা)-এর কথা

তাঁর মনে পড়ে গেল। তাই তিনি ছুটে গেলেন হযরত আবু বকর (রা)-এর কাছে। হযরত আবু বকর (রা) ইতোমধ্যেই ইসলাম কবুল করে মুসলমান হয়েছেন। এ বিষয়টি হযরত উসমান (রা)-এর জানা ছিল না। উসমান (রা) আবু বকর (রা)-কে পেয়ে তাঁর মনের সব কথা খুলে বললেন।

আবু বকর (রা) সব শুনে উসমান (রা)-কে সান্ত্বনা দিলেন এবং স্থির হয়ে বসতে উপদেশ দিলেন। খানিকটা স্বস্তির হলে আবু বকর (রা) বন্ধু উসমান (রা)-কে মহানবী (সা) ও তাঁর সত্য দীন সম্পর্কে একটা ধারণা দিলেন। আবু বকর (রা) বললেন, 'মুহাম্মদ (সা) আল্লাহর প্রেরিত দূত এবং রাসূল। তিনি সত্য দীনসহকারে দুনিয়ায় এসেছেন। তিনি সত্যবাদী এবং ন্যায়বান। তাই আমি তাঁকে মেনে নিয়েছি। আমি বলি, তুমিও এ সত্যকে গ্রহণ করে ধন্য হও।'

উমসান (রা)-এর মন আগে থেকেই সত্যের জন্য উদগ্রীব ছিল। এবার বন্ধু আবু বকর (রা)-এর সান্নিধ্য ও অনুপ্রেরণা পেয়ে তিনি যেন স্বস্তি পেলেন। আর এক মুহূর্তও অপেক্ষা না করে উসমান (রা) মহানবী (সা)-কে স্বীকার করে নিলেন। তিনি সত্যের পথে নিজেকে সপে দিয়ে মুসলমান হয়ে গেলেন। উসমান (রা)-এর ইসলাম কবুলের খবর বিদ্যুৎ গতিতে মক্কার সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ল। এ খবর শুনে এলাকার কাফের-কুরাইশরা ক্ষেপে গেল। তাঁরা মুহাম্মদ (সা)-এর দীনকে পছন্দ করত না বলে যারাই ইসলাম গ্রহণ করত তারাই এসব কাফেরদের তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যের শিকার হতো। উসমান (রা)-এর বেলায়ও ঘটল একই ঘটনা। তিনি ধনী মানুষ এবং সমাজে প্রভাবশালী। তারপরও তিনি কাফের-মোশরেকদের ক্ষোভ থেকে রেহাই পেলেন না।

এতদিন উসমান (রা) কুরাইশদের কাছে একজন সম্মানিত ব্যক্তি হিসেবে বেশ মর্যাদা পেয়ে আসছিলেন। তারা উসমান (রা)-এর ব্যবহার ও কথাবার্তায় মুগ্ধ ছিল। তাঁকে তারা মুরব্বি বলে মানত এবং তাঁর কথা শুনত। অথচ ইসলাম কবুল করার সাথে সাথে উসমান (রা) কুরাইশদের শত্রুতে পরিণত হলেন। যারা তাঁকে যারপরনাই ভালোবাসত, তারাই এখন তাঁকে ঘৃণা করতে শুরু করল। শুধু তাই নয়, কাফের কুরাইশরা উসমান (রা)-কে নানাভাবে কটাক্ষ করতে লাগল। তাঁকে কথায় কথায় টিটকারী ও বিদ্রূপের ভাষায় অপমানিত করল। তাঁর ওপর নেমে এলো নানা প্রকার

অত্যাচারও। তিনি ইসলামের শক্রদের প্রচণ্ড ক্ষোভ ও চরম লাঞ্ছনার শিকার হলেন। আত্মীয়-স্বজনরাও তাঁকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতে লাগল।

আপনজন যারা হযরত উসমান (রা)-কে প্রাণের চেয়েও বেশি ভালোবাসত, তারাই এখন তাঁকে নানাভাবে আহত করতে লাগল। তারাও উসমান (রা)-এর ওপর নানা ধরনের অত্যাচার-নিপীড়ন শুরু করে দিল। সবাই মিলে তাঁকে ইসলাম ত্যাগ করার জন্য প্রচণ্ড রকম চাপ দিতে থাকল।

অথচ উসমান (রা) কাফের-মোশরেক এবং আত্মীয়-স্বজনদের সব অত্যাচার মুখ বুজে সহ্য করলেন। তিনি অত্যাচারে আহত হলেন, গালমন্দ ও ঠাট্টা-বিদ্রূপের কারণে মনে কষ্ট পেলেন, কিন্তু আল্লাহর দীন থেকে একচুলও পিছপা হলেন না।

উসমান (রা) ইসলামকেই সাথী করে একমনে পথ চলতে লাগলেন। অত্যাচারের ঝড-তুফান তীব্র গতিতে তাঁকে জড়িয়ে ধরল। এতে তিনি পিছিয়ে গেলেন না, বরং দু'পায়ে সব বাধা মাড়িয়ে ঈমানের ফুলকি বুকে চাপিয়ে অগ্রসর হলেন। এ বিপদের সময় অনেক বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়-স্বজন তাঁকে ত্যাগ করল। তাতেও তিনি ঘাবড়ালেন না, বরং মহান আল্লাহ ও তাঁর রাসুল (সা)-কে আপন করে দুর্বার গতিতে সামনের দিকে এগিয়ে চললেন।

ইসলাম কবুল করে উসমান (রা) আর চুপচাপ বসে থাকলেন না। তিনি ইসলামের বাণী প্রচারের কাজে লেগে গেলেন। কাফেরদের অত্যাচার ও বাধার মুখেও তিনি পিছ পা হলেন না। মক্কার প্রতিকূল পরিবেশে ইসলামের আওয়াজ বুলন্দ করতে তিনি দিনরাত কাজ করতে লাগলেন। এরপর জেহাদ ও সমরে তিনি কাফেরদের সাথে প্রাণপণ লড়াই করলেন। সব ক্ষেত্রেই আল্লাহর দীনকে বিজয়ী করতে জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি টিকে থাকলেন।

ব ল তে পা রো ?

১. উসমান (রা) কিভাবে মুসলমান হলেন?

২. একদা বিশ্রামের সময় তিনি কী স্বপ্নে দেখলেন?

৩. তাঁর খালার নাম কী ছিল? তিনি কেমন মহিলা ছিলেন?

৪. ইসলাম কবুল করে উসমান (রা) কী রকম বাধা পেলেন?

খলিফারূপে উসমান (রা)

দেখতে দেখতে ইসলামের কাজ দিক-দিগন্তে ছড়িয়ে পড়ল। একসময় ইসলাম বিজয়ের বেশে দেশে দেশে প্রসার লাভ করল। এরি মধ্যে মক্কাও বিজিত হলো। মদীনায় কায়েম হলো ইসলামী খেলাফত। প্রিয়নবী মুহাম্মদ (সা) ইহজগৎ ছেড়ে চলে গেলেন। চলে গেলেন ঘনিষ্ঠ সঙ্গী হযরত আবু বকর (রা)ও। আবু বকর (রা)-এর পর তাঁরই সঙ্গী হযরত উমর (রা) ইসলামী খেলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করলেন। তিনি ছিলেন ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা। প্রায় অর্ধ দুনিয়া শাসন করতেন তিনি।
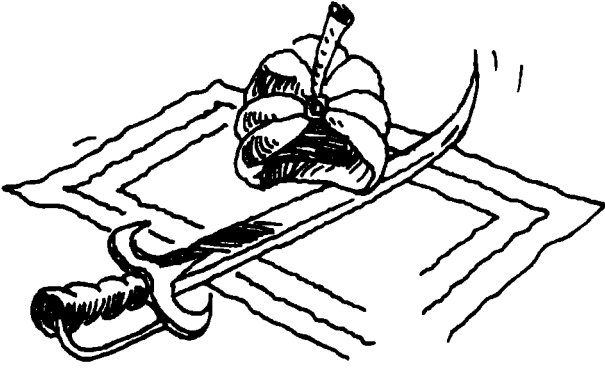
দেখতে দেখতে উমর (রা)-এর শাসনকালও শেষ হয়ে গেল। উমর (রা) খেলাফতের শেষপ্রান্তে এসে মুমূর্ষু হয়ে পড়লেন। তাই তিনি খেলাফতের দায়িত্ব নিয়ে ভীষণ ভাবনায় পড়ে গেলেন।

এ অবস্থায় খলিফা হযরত উমর (রা) ইসলামী রাষ্ট্রের পরবর্তী খলিফা নিজেই নির্বাচন করে যাবেন বলে মনস্থির করলেন। উমর (রা) ছিলেন বেশ বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ। তাই খলিফা নির্বাচনের কাজটি তিনি একা একা সেরে যেতে চাইলেন না। এ নিয়ে অনেকদিন ধরে অনেক ভাবনাচিন্তা করলেন।

অনেকের সাথে কথাও বললেন, অনেকের একান্ত পরামর্শ নিলেন। এতেও তিনি সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারলেন না। এ অবস্থায় উমর (রা) বিশিষ্ট সাহাবীদের ছয়জনকে নিয়ে একটি শুরা গঠন করলেন। তাদের ওপরই খলিফা নির্বাচন করার গুরু দায়িত্ব অর্পণ করা হলো। উমর (রা)-এর শুরার সদস্যরা ছিলেন–১. হযরত আলী (রা), ২. হযরত উসমান (রা), ৩. হযরত যুবাইর (রা), ৪. হযরত তালহা (রা), ৫. হযরত সাদ ইবনে আবী ওয়াক্কাস ও ৬. হযরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রা)। খলিফার পরামর্শ অনুযায়ী কমিটির সদস্যরা তাদের কাজ শুরু করে দিলেন। উমর (রা) খলিফা নির্বাচনের কাজটি তাড়াতাড়ি সেরে ফেলতে কমিটিকে তাগাদা দিলেন। এটা নিয়ে কমিটির সদস্যরাও ছিলেন বেশ তৎপর। কেননা, তাঁরা দেখছিলেন খলিফার শরীরের অবস্থা তেমন ভালো যাচ্ছিল না।

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর স্ত্রী বিবি আয়েশা (রা) তখনও বেঁচে ছিলেন। তিনি এখন সবার মুরব্বি। তিনি সবার প্রিয় ও সবার কাছে সম্মানিতা। তাই তাঁর গৃহেই খলিফা নির্বাচন নিয়ে শলা-পরামর্শ চলতে লাগল। অনেকদিন ধরে চলল বিরামহীন বৈঠক। কিন্তু খলিফা নির্বাচনের ব্যাপারে কোনো সুরাহায় উপনীত হওয়া কঠিন হলো।

এদিকে সময়ও দ্রুত ফুরিয়ে যাচ্ছিল। উমর (রা) তাই বেশ অস্থির হয়ে পড়লেন। তিনি কাজটি সেরে ফেলার জন্য কমিটিকে বারবার তাগাদা দিচ্ছেন। ফলে সবার মধ্যে ক্রমেই বাড়ছিল উদ্বেগ, বাড়ছিল উত্তেজনা।

কোনোভাবেই যখন খলিফা নির্বাচনের বিষয়টির সুরাহা হচ্ছিল না, তখন কমিটির সবাই ভীষণ ভাবনায় পড়ে গেলেন। অবশেষে আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রা)-এর মাথায় এক বুদ্ধি এলো। তিনি খলিফা নির্বাচনের বিষয়ে সম্মিলিত বৈঠকের পথ পরিহার করলেন। হযরত আউফ (রা) সবার সাথে আলাদা আলাদা করে বৈঠকে বসলেন এবং তাঁদের সাথে আলাদাভাবে পরামর্শ করলেন।

আবদুর রহমান (রা) সবার মতামত গভীর মনোযোগসহকারে শুনলেন। অধিকাংশ শুরা সদস্যের মত গেল উসমান (রা)-এর পক্ষে। এভাবে পরামর্শ শেষ করে হযরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রা) হযরত উমর (রা)-এর সাথে কথা বললেন। তারপর তিনি হযরত উসমান (রা)-কে খলিফা বলে ঘোষণা দিলেন।

এতদিন ধরে খলিফা নির্বাচন নিয়ে যে অস্থিরতা ও সব জল্পনা কল্পনা চলছিল তার অবসান ঘটল। উসমান (রা) নির্বাচিত হলেন ইসলামের তৃতীয় খলিফা। সেটি ছিল ৬৪৪ খ্রিষ্টাব্দ বা ২৩ হিজরি সাল।

ব ল তে পা রো ?

১. হযরত উমর (রা) অসুস্থ হয়ে পড়ার পর তিনি কী ভাবলেন?

২. খলিফা নির্বাচনের জন্য তিনি শেষমেশ কী করলেন?

৩. খলিফা নির্বাচনের গঠিত শুরার সদস্য কারা ছিলেন?

৪. হযরত আউফ (রা) অবশেষে কী ব্যবস্থা নিলেন?

৫. উসমান (রা) কখন খলিফা নির্বাচিত হলেন?

উসমান (রা)-এর ন্যায়বিচার

খলিফা উসমান (রা) ছিলেন সত্যনিষ্ঠ এক মহাপুরুষ। ন্যায়নীতি ও সত্যের সাথে আপস করার মতো লোক তিনি ছিলেন না। তাই সবাই তাঁকে ভালোবাসত, আপন বলে জানত। জনগণ সবাই নিশ্চিত ছিল যে, সমাজ ও রাষ্ট্রে তাদের অধিকার নিয়ে কেউ অন্যথা করতে পারবে না।

উসমান (রা)-এর আমলে ন্যায়বিচারের ঐতিহ্য অক্ষুণ্ণ থাকায় মানুষ সুখ ও শান্তিতে বাস করতে পারত। কাফের মোশরেকরাও উসমান (রা)-এর ন্যায়বিচারে সন্তুষ্ট ছিল। অন্যায় করে কেউ হযরত উসমান (রা)-এর কাছ থেকে করুণা পেত না। এমনকি তাঁর আপনজনও ন্যায়নীতি ভঙ্গ করে রেহাই পেত না।
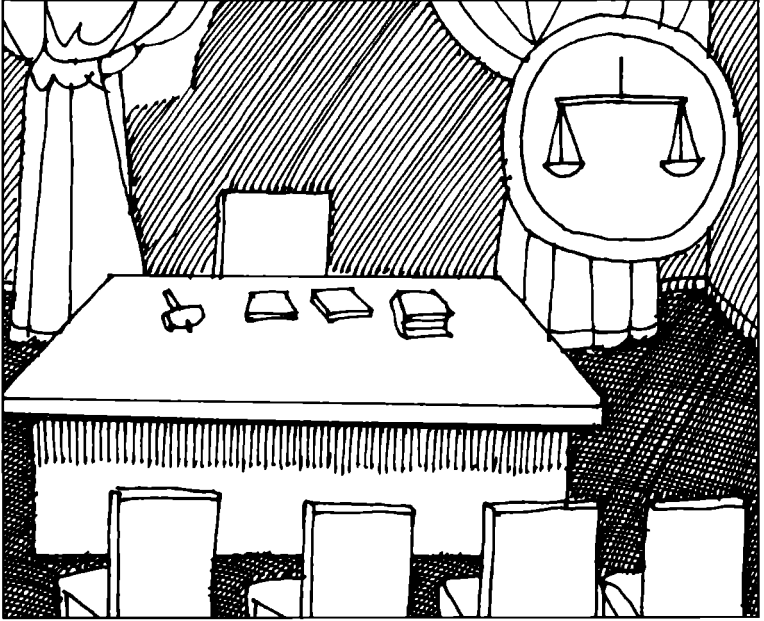
ওয়ালিদ ইবনে উকবা নামে উসমান (রা)-এর এক ভাই ছিল। তিনি ইরাকে কুফার গভর্নর হিসেবে দায়িত্ব পালন করছিলেন। উসমান (রা)-এর ভাই হলে কী হবে? তিনি মোটেও ভালো লোক ছিলেন না।

গভর্নর হওয়ার পর ওয়ালিদের চরিত্র নিয়ে নানা ধরনের কথা উঠল। তার স্বভাব-চরিত্র নিয়ে অনেক তথ্য প্রকাশিত হয়ে পড়ল। কুফার সর্বত্র ওয়ালিদের দুশ্চরিত্র নিয়ে ব্যাপক আলোচনা চলছিল।

একবার ওয়ালিদের বিরুদ্ধে মদ্যপানের অভিযোগ পাওয়া গেল। শেষ পর্যন্ত এ অভিযোগ হযরত উসমান (রা)-এর কানে গিয়ে পৌঁছল। অভিযোগ শুনে খলিফা উসমান (রা) ভীষণ ক্ষুব্ধ হলেন।

তার বিরুদ্ধে আরো এক গুরুতর অভিযোগও এলো। একদিনের এক ঘটনা। ওয়ালিদ ফজরের নামাজ পড়ছিলেন। ফজরের দু'রাকাত ফরজ নামাজ পড়তে গিয়ে তিনি ভুলক্রমে চার রাকাত নামাজ পড়ে ফেললেন। তবে মজার ব্যাপার হলো, তখন থেকে তিনি ফজরের ফরজ নামাজ চার রাকাত বলে ঘোষণা করে বসলেন। তার এ ঘোষণা নিয়ে মুসলমানদের মধ্যে তোলপাড় শুরু হলো। ফলে চারদিকে বেধে গেল মহা হইচই।

কুফার লোকেরা ওয়ালিদের অস্বাভাবিক কাণ্ডকীর্তি নিয়ে কানাঘুষা করতে লাগল। এতে মুসলমানরা সবাই অবাক হলো। ব্যাপার কী? ওয়ালিদের কী হলো? তিনি নামাজ নিয়ে এ কোন নতুন কথা বলছেন! খোঁজ-খবর নিয়ে মুসলমানরা ওয়ালিদের ওপর বেশ নাখোশ হলো।

ওয়ালিদের এ বিষয়টি নিয়ে অনেকে খোঁজখবর নিতে শুরু করল। অবশেষে জানা গেল ওয়ালিদ মদ পান করতেন। তিনি মাতাল অবস্থায় নামাজ পড়ছিলেন। তাই ফজরের ফরজ নামাজ চার রাকাত বলে ঘোষণা দিয়েছিলেন। ওয়ালিদের এ আজগুবি ঘোষণার কথা কেবল কুফার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকল না। খলিফা উসমান (রা)-এর কানেও উঠল এ খবর। এর আগেও ওয়ালিদের ব্যাপারে নানাজনে নানান কথাবার্তা শোনা যাচ্ছিল। এসব শুনে খলিফা ওয়ালিদ ইবনে উকবার ওপর খুব রুষ্ট হলেন। তাই উসমান (রা) ওয়ালিদকে কঠোর শাস্তি দেওয়ার চিন্তাভাবনা করলেন।

তাৎক্ষণিক কাজ হিসেবে উসমান (রা) ওয়ালিদকে কুফার গভর্নরের পদ থেকে অব্যাহতি দিয়ে এক ফরমান জারি করলেন। গভর্নরের পদ থেকে

তাকে অব্যাহতি দিয়েই খলিফা ক্ষান্ত হলেন না। ইসলামী আইন মোতাবেক তার উপযুক্ত বিচারের ব্যবস্থাও করা হলো। বিচারে সাক্ষ্য প্রমাণ গ্রহণ করলে ওয়ালিদ দোষী বলে প্রমাণিত হলেন।

বিচারের রায় অনুযায়ী ওয়ালিদের শাস্তির ব্যবস্থাও করা হলো। তাকে আশিটি চাবুক মারার নির্দেশ জারি করা হলো।

উসমান (রা) কালক্ষেপণ না করে এ রায় কার্যকর করার ত্বরিত ব্যবস্থা করলেন। ওয়ালিদ উসমান (রা)-এর ভাই। তাই বলে ভাইয়ের প্রতি তিনি কোনো প্রকার অনুকম্পা দেখালেন না। খলিফার ভাই হয়েও বিচারের ফাঁক গলিয়ে বেরিয়ে যেতে পারল না ওয়ালিদ।

ন্যায়পরায়ণ খলিফা উসমান (রা)-এর বিচার দেখে সবাই বিস্মিত হলো এবং তাঁকে ধন্যবাদ জানাল।

বলতে পারো?

১. হযরত উসমান (রা) কেমন লোক ছিলেন?

২. ওয়ালিদ কে ছিল? সে কী প্রকৃতির লোক ছিল?

৩. ওয়ালিদের অন্যায়কে উসমান (রা) কিভাবে দমন করলেন?

৪. ওয়ালিদকে কী ধরনের শাস্তি দেওয়া হলো?

আল্লাহর ভয়ে কাঁপে মন

হযরত উসমান (রা) ছিলেন একজন বড় মাপের বিশিষ্ট সাহাবী। রাসূল (সা)-এর অনুগামী সাচ্চা মুমিন ছিলেন তিনি। তাঁর মন ছিল নরম প্রকৃতির। তাই তিনি সবসময় আল্লাহর ভয়ে নতজানু থাকতেন।

আল্লাহতাআলার আদেশ-নিষেধ পালনে তিনি সদা সতর্ক ছিলেন। কখনও কোনো ভুল হলে তীব্র অনুশোচনায় খলিফার মন কেঁপে উঠত। তাঁর মনে একটাই ভয়-যদি আল্লাহ তাঁর কোনো ভুলের জন্য তাঁকে পাকড়াও করেন।

একদিন ঘটল এক ঘটনা। এক শুক্রবারে খলিফা ক্রীতদাস মুক্ত করার কাজে ব্যস্ত ছিলেন। কথিত আছে যে, খলিফা উসমান (রা) প্রায় প্রতি শুক্রবারেই ক্রীতদাস মুক্তির ব্যবস্থা করতেন। এ কাজকে তিনি অসীম সওয়াব ও মানবতার মুক্তির মহান দায়িত্ব বলে মনে করতেন।

সেদিন তাঁর কাছে এলো এক বেয়ারা ক্রীতদাস। কারণবশত তিনি এ ক্রীতদাসের ব্যবহারে রুষ্ট হলেন। তাই জেদের বশে ক্রীতদাসের কান মলে দিলেন। কিন্তু পরক্ষণেই এ ঘটনা তাঁর মনে ভীষণ অনুতাপের সৃষ্টি করল। উসমান (রা) ভাবলেন যে কাজটা তিনি করেছেন, তা ঠিক করেননি, বরং তার বড় অন্যায় হয়েছে। এ অনুশোচনায় উসমান (রা) কাতর হয়ে পড়লেন। উসমান (রা)-এর মন আল্লাহর শাস্তির ভয়ে কেঁপে উঠল।

এসব চিন্তা ভাবনায় উসমান (রা) আর স্থির থাকতে পারলেন না। তাই ক্রীতদাসকে তিনি কাছে ডেকে আনলেন।

খলিফার ডাক পেয়ে ক্রীতদাস ঘাবড়ে গেল। সে ভাবল, খলিফা তাকে আবার কোনো কঠিন শাস্তি দেন কি না।

তারপরও খলিফার হুকুম। তাই লোকটি ভয়ে ভয়ে খলিফার কাছে গিয়ে হাজির হলো। উসমান (রা) ক্রীতদাসের কাছে যেন লজ্জা পেলেন। তাই তাকে খুব নরমভাবে বললেন, 'ভাই, আমি তোমার কান মলে মহাভুল করে ফেলেছি। তোমার ওপর জুলুম করায় আমার কঠিন পাপ হয়েছে। তুমি আমার এ অন্যায়ের প্রতিশোধ নিয়ে আমাকে মুক্ত করে দাও। আমাকেও তুমি সেই শাস্তিই দাও যা আমি তোমাকে দিয়েছি। এটাই যে আমার প্রাপ্য।'

ক্রীতদাস খলিফার কথা শুনে হতবাক হয়ে গেল। একি কথা শুনছে সে? না কি কেউ কোনোদিন এমন কথা শুনেছে? একজন গোলাম হয়ে খলিফার কান মলে দিতে হবে!– না, না, তা হয় না। অত বড় মহান খলিফার কান ছুঁতে হবে!-এটা কখনও সম্ভব নয়।

ক্রীতদাস তাই বিনীতভাবে বলল, 'হে মহান খলিফা, আপনি একি কথা বলছেন? আমি আপনার কান মলে দিতে পারব না। আমার পক্ষে তা কখনও সম্ভব নয়, মরে গেলেও নয়।'

কিন্তু খলিফা যে নাছোরবান্দা। তিনি তাঁর অপরাধের জন্য আল্লাহর কাছে পাকড়াও হওয়ার ভয় পাচ্ছিলেন। তাই তিনি তাঁর কান মলে দিতে গোলামকে বাধ্য করলেন।

অবশেষে গোলাম নিরুপায় হলো। সে উসমান (রা)-এর কান স্পর্শ করেই ছেড়ে দিল। ক্রীতদাসের এ দায়সারা গোছের কাজকে উসমান (রা) মেনে নিতে পারলেন না। তিনি বললেন, 'না ভাই, এভাবে নয়। আমি যত জোরে

তোমার কান টেনেছিলাম, তুমিও তত জোরেই আমার কান টেনে দাও। আমি আমার ভুলের প্রায়শ্চিত্ত আখেরাতে গিয়ে পেতে চাই না। পৃথিবীর শাস্তি পরকালের আযাবের চেয়ে অনেক সহজ।'

উসমান (রা)-এর মনে আল্লাহ্‌র যে ভয় কাজ করছিল তা দেখে ক্রীতদাস অবাক হয়ে গেল। তাঁর এমন খোদাভীতি ছিল সত্যিই বিস্ময়কর।

ব ল তে পা রো ?

১. উসমান (রা) কাকে বেশি ভয় পেতেন?
২. অনেক সময় শুক্রবারে তিনি কী করতেন?
৩. ক্রীতদাসকে তিনি কী করে ছিলেন?
৪. ক্রীতদাস উসমান (রা)-এর ওপর কী প্রতিশোধ নিল?
৫. উসমান (রা)-এর ব্যবহারে ক্রীতদাস কী করল?

উসমান (রা) হলেন গনি

সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে তখন খোদাহীন মানুষ ঘাপটি মেরে বসেছিল। ইসলামের শত্রুরা ঘিরে রেখেছিল চারদিক। ইসলামকে শেষ করতে এরা সর্বদা তৎপর। সুযোগ পেলেই শত্রুরা ইসলামের সর্বনাশ করতে চায়। মুসলমানরা তাদের কাছে একেবারে অপছন্দ। পারলে দুনিয়া থেকেই মুসলমানদের সরিয়ে ফেলতে চায় কাফের-মোশরেকরা।

কাফের দুশমনরা পারে না এমন কোনো অপকর্ম নেই। মদীনার পাশেই তখন ছিল রোম সাম্রাজ্য। এরা চরম ইসলামবিদ্বেষী কাফের। মুসলমানদের এক নম্বর শত্রু ছিল তারা। রোম সম্রাট পারে না ইসলামের আলো যেন ফুৎকারে নিভিয়ে ফেলতে চায়।

মরুময় আরবে তখন চলছিল ভরপুর গ্রীষ্মকাল। মরুভূমির বালুতে চলছিল খরতাপের ভয়ঙ্কর তাণ্ডব। বাতাসে ছড়িয়ে পড়েছিল আগুনের তীব্র লেলিহান।

এমন দুর্যোগের সময় রোমান সম্রাট মদীনা রাষ্ট্রকে নিশ্চিহ্ন করার সিদ্ধান্ত নিল। তাই তারা মুসলমানদের ওপর আক্রমণ করার প্রস্তুতি নিল। এ জন্য তারা লক্ষাধিক সৈন্য নিয়ে মদীনা আক্রমণের জন্য তৈরি হলো। মহানবী (সা)-এর কানে এসে পৌঁছাল এ খবর। এতে তিনি খুব উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লেন। কেন না রোমক সৈন্যদের মোকাবেলা করার মতো প্রস্তুতি মুসলমানদের মোটেও ছিল না।

তারপরও করার মতো কিছুই ছিল না। শত্রুরা লড়তে আসছে, বসে তো আর থাকা যায় না? দেশ বাঁচাতে হলে যুদ্ধ করা ছাড়া রাসুল (সা)-এর সামনে আর কোন উপায়ও ছিল না।

মহানবী (সা) অনেক ভেবেচিন্তে মুসলমানদের সবাইকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি নিতে আহ্বান জানালেন। মহানবী (সা)-এর নির্দেশ। তাই মুসলমানরা দলে দলে এসে যুদ্ধের জন্য জড়ো হতে লাগল।

রাজধানী মদীনায় যুদ্ধের প্রস্তুতি চলছে পুরোদমে। সে সময় মুসলমানদের সামনে বড় এক সমস্যা এসে হাজির হলো। মদীনায় খাবার পানির প্রচণ্ড অভাব দেখা দিল। খাবারের জন্য পানি জোগাড় করা কঠিন হয়ে পড়ল। তা ছাড়া যুদ্ধের জন্য অস্ত্রশস্ত্র জোগাড় করা নিয়েও সমস্যা হলো। মুসলমানদের ডাল-তলোয়ার ছিল অতি নগণ্য। যদিও দুনিয়াবী সামগ্রীর ওপর মহানবী (সা) নির্ভরশীল ছিলেন না। কেননা, তিনি জানেন, শত্রুদের সাথে লড়তে আল্লাহর সাহায্যই যথেষ্ট। দুনিয়াবী অস্ত্রের বলে যে লড়াই করা যাবে না, তা মহানবী (সা) ভালো করেই জানতেন। তারপরও কিছু একটা প্রস্তুতি তো লাগেই। তাই সামান্য যা কিছু আছে তা নিয়েই প্রস্তুতি সম্পন্ন করলেন মহানবী (সা)।

মহানবী (সা) মুসলমান সবাইকে সামর্থ্য অনুযায়ী এগিয়ে আসার আহ্বান জানালেন। তিনি ঘোষণা করলেন, 'আজ ইসলামের প্রয়োজনে যে যা দান করবে জান্নাতে সে তার বহুগুণ উত্তম ফল পাবে।'

মহানবী (স)-এর এ আহ্বান বেশ কাজে লাগল। নবী (সা)-এর নির্দেশ শুনে মুসলমানরা যেন এক জান্নাতী প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হলো। তারা সব কিছু উজার করে দান করার তীব্র প্রতিযোগিতায় নেমে পড়ল। কে কাকে ফেলে বেশি

দান করবে, এ প্রতিযোগিতায় মদীনায় তোলপাড় শুরু হয়ে গেল। রাসুল (সা)-এর সাহাবীদের মধ্যে যারা অগ্রবর্তী ছিলেন তারা সর্বস্ব ত্যাগ করার উপামা স্থাপন করলেন। হযরত উসমান (রা) সে বছর তাঁর ব্যবসায় অধিক মুনাফা করার সৌভাগ্য লাভ করেন। এমনিতেই তিনি দানের বেলায় সবসময় অগ্রগামী ছিলেন। মুসলমানদের এ দুর্দিনে তিনি আরও বেশি উদ্যমী হলেন। সবাই মিলে যা দান করলেন তার প্রায় তিন ভাগের এক ভাগ একাই দান করলেন হযরত উসমান (রা)। তিনি এক হাজার উট, সত্তরটি ঘোড়া আর এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা দান করে সবাইকে অবাক করে দিলেন। তাঁর দানের সামগ্রী দিয়ে মদীনার এক বিরাট মাঠ পরিপূর্ণ হয়ে গেল।

হযরত উসমান (রা)-এর অঢেল দান পেয়ে মহানবী (সা)-এর মন ভরে গেল। তিনি খুবই খুশি হলেন। মহানবী (সা)-এর আনন্দ আর কে দেখে! মহানবী (সা) হযরত উসমান (রা)-এর দানসামগ্রী পেয়ে খুশিতে ঘোষণা করলেন, 'বড়ই ভালো কাজ করেছে উসমান। আজ থেকে উসমানের কোনো কাজে কেউ ক্ষতি করতে পারবে না।'

মহানবী (সা) আরও বললেন,'উসমান! তুমি গনি। আল্লাহতাআলা তোমাকে অবশ্যই পুরস্কৃত করবেন।'

সেদিন থেকেই হযরত উসমান (রা) হয়ে গেলেন উসমান গনি। 'গনি' অর্থ ধনী। উসমান (রা) ধনী হলে কী হবে? এ বিষয় নিয়ে তাঁর কোনো অহঙ্কার ছিল না। ধনী হলেও তিনি সবসময় আল্লাহর কাজেই মশগুল থাকতেন।

ব ল তে পা রো ?

১. রোমান সম্রাট মুসলমানদের বিরুদ্ধে কী করার প্রস্তুতি নিল?
২. তখন আরবের পরিবেশ কেমন ছিল?
৩. মহানবী (সা) যুদ্ধ করার জন্য কী প্রস্তুতি নিলেন?
৪. তিনি কী ঘোষণা করলেন?
৫. হযরত উসমান (রা) যুদ্ধের জন্য কী কী দান করলেন?
৬. উসমান (রা)-এর দান পেয়ে আল্লাহর নবী কী বলেছিলেন?

রাসূল (সা)-এর প্রতি ভালোবাসা

আমাদের প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ (সা) সর্বদা দীনহীনভাবে জীবনযাপন করতেন। দুনিয়ার আরাম-আয়েশ বা অর্থ-সম্পদের আকর্ষণ তাঁকে মোটেও স্পর্শ করতে পারেনি, বরং ধন-সম্পদের সংস্পর্শ থেকে তিনি সবসময় দূরে থাকতেন। জানা যায়, এমন বহুদিন গেছে যখন মহানবী (সা) না খেয়ে দিনাতিপাত করেছেন। তিনি নিজেই যে শুধু উপোস করেছেন তা নয়, পরিবারের সকলকে নিয়েও তাঁকে উপোস থাকতে হতো। অথচ অনেকেই মহানবী (সা)-এর এ অবস্থার কথা জানত না।
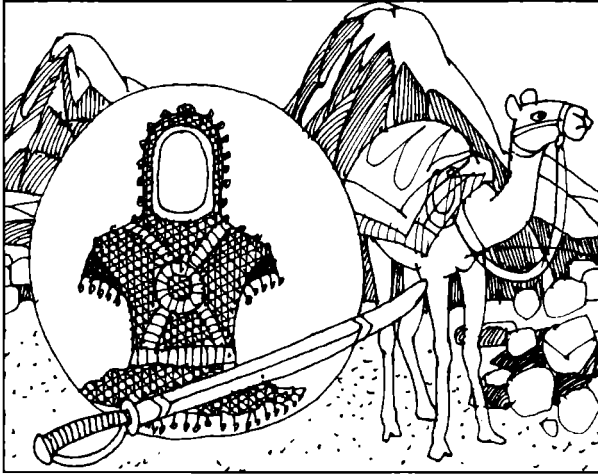
একবার হযরত উসমান (রা) শুনতে পেলেন যে, রাসূল (সা) তাঁর পরিবারের সবাইকে নিয়ে চারদিন ধরে না খেয়ে আছেন। এ কথা শুনামাত্র হযরত উসমান (রা) অস্থির হয়ে পড়লেন। তিনি নবীজির এ দুঃখের কথা শুনে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে শুরু করে দিলেন। মহানবী (সা) উপোস রয়েছেন –এ খবর উসমান (রা)-এর বুককে দীর্ণ-বিদীর্ণ করে দিল। তাই

তিনি কালবিলম্ব না করে প্রচুর খাদ্য সামগ্রী রাসূল (সা)-এর খেদমতে পাঠিয়ে দিলেন। সাথে পাঠালেন তিন'শ দিরহামও।

অন্য আরেকটি ঘটনা। মহানবী (সা) হযরত আলী (রা)-এর সাথে তাঁর কলিজার টুকরো কন্যা হযরত ফাতেমার বিয়ে পাকাপাকি করে ফেলছেন। আলী (রা) ছিলেন অতিশয় দরিদ্র। তাই বিয়ের খরচপাতি চালাবার মতো কোনো সম্পদ হযরত আলী (রা)-এর হাতে ছিল না। নিজের সম্পদ বলতে ছিল একটিমাত্র তরবারি, একটি বর্ম আর একটি উট। এগুলো সব বিক্রি করেও বিয়ের অর্থ জোগাড় করা সম্ভব ছিল না।

কী আর করা! যা আছে তা দিয়েই বিয়ের খরচ চালাবার চিন্তা করলেন আলী (রা)। অবশেষে আলী (রা) সিদ্ধান্ত নিলেন তার একমাত্র বর্মটি তিনি বিক্রি করে দেবেন। এতে যা পাবেন তা দিয়েই কোনো রকমে বিয়ের খরচপাতি সেরে ফেলবেন। পরিকল্পনা মোতাবেক একদিন তিনি বর্ম হাতে নিয়ে বাজারের দিকে রওয়ানা হলেন। পথিমধ্যে হযরত উসমান (রা)-এর সাথে তাঁর দেখা হয়ে গেল। উসমান (রা) হযরত আলী (রা)-কে তাঁর কুশলাদি জিজ্ঞেস করলেন এবং বিয়ের খোঁজখবর নিলেন। তিনি জানতে পারলেন, আলী (রা) বাজারে যাচ্ছেন তাঁর বর্মটি বিক্রি করার জন্য। আলী (রা)-এর দুর্দশার কথা শুনে হযরত উসমান (রা) মনে খুব কষ্ট পেলেন। আলী (রা) বিয়ে করবেন, অথচ তার খরচ বহন করার জন্য বর্ম বিক্রি করতে হবে? এ কেমন কথা? উসমান থাকতে তা হতে পারে না–এ কথা ভাবলেন উসমান (রা)।

তাই তিনি মনে মনে ঠিক করলেন হযরত আলী (রা)-কে তিনি সাহায্য করবেন। কিন্তু তিনি ভালো করেই জানেন, তাঁর এ সাহায্য আলী (রা) গ্রহণ করবেন না। তাই বর্মটি নিজেই কিনে নেয়ার কৌশল আঁটলেন উসমান (রা)। এ সুযোগে তিনি আলী (রা)-কে যথাসম্ভব সাহায্য করবেন। উসমান (রা) আলী (রা)-কে উদ্দেশ করে বললেন, 'হে আলী! আপনার বর্মটি আমি কিনতে চাই। কী দাম হবে, আমি তাই দেব।'

উসমান (রা) আলীর বর্ম কিনবেন! আলী (রা) কিছুটা অবাকই হলেন। উসমান (রা) তাঁর নিজের লোক। তাই দাম চান কিভাবে? আলী (রা) তাই বেশ লজ্জায় পড়ে গেলেন। হযরত আলী (রা)–এর এ অবস্থা দেখে উসমান (রা) নিজে থেকেই বর্মের দাম হাঁকালেন। উসমান (রা) বর্মের দাম বললেন

চার'শ দিরহাম। বর্মের এত বেশি দাম শুনে আলী (রা) তো হতবাক। কেননা, বর্মটির দাম বড় জোর এক'শ দিরহাম হতে পারে।

উসমান (রা)-এর পরিকল্পনা যে অন্য কিছু ছিলো আলী (রা) কিন্তু তা বুঝতে পারেননি। তাই উসমান (রা) কথামতো চার'শ দিরহামই আলী (রা)-এর হাতে গুঁজে দিলেন। এত বেশি দাম নিতে আলী (রা) খুব লজ্জা পেলেন। তারপরও হযরত উসমান (রা)-এর পীড়াপীড়িতে অবশেষে চার'শ দিরহামই তাঁকে নিতে হলো। আলী (রা) বর্মটি উসমান (রা)-এর হাতে তুলে দিয়ে বাড়ি ফিরে যেতে উদ্যত হলেন। এমন সময় উসমান (রা) হঠাৎ আলী (রা)-এর পথ আগলে দাঁড়ালেন। তিনি তো আসলে কেনার জন্য বর্ম কেনেননি! তাই সেটি আবার আলী (রা)-কেই ফেরত দিতে চাইলেন।

উসমান (রা) বললেন, 'শুনুন আলী! এ বর্মটি খুবই সুন্দর। এটা আমার প্রয়োজন নেই। আপনার মতো একজন বীরের হাতেই কেবল তা শোভা পায়। এ বর্মের জন্য আপনার চেয়ে উপযুক্ত ব্যক্তি আর কেউ নন। তাই বর্মটি আপনাকেই দিয়ে দিলাম। আপনি বর্মটি গ্রহণ করুন।'

আলী (রা) উসমান (রা)-এর এ কাণ্ড দেখে থমকে গেলেন। তিনি বেশ ইতস্তত করছিলেন। কিন্তু উসমান (রা)-এর মতো অভিভাবকের অনুরোধ ফিরিয়ে দেয়ার সাহস পেলেন না।

পরিশেষে হযরত আলী (রা) তাঁর বর্ম ও চার'শ দিরহাম নিয়ে বাড়ি ফিরে গেলেন। বাড়ি ফিরে গিয়ে আলী (রা) সব ঘটনা মহানবী (সা)-কে খুলে বললেন। উসমান (রা)-এর বদান্যতার ঘটনা শুনে মহানবী (সা) যারপরনাই খুশি হলেন। তিনি হযরত উসমান (রা)-এর জন্য মন ভরে দোয়া করলেন।

নবী (সা)-এর পরিবার এবং তাঁর প্রতি উসমান (রা)-এর যে অপরিসীম ভালোবাসা ছিল, এ ঘটনা থেকেই তার প্রমাণ পাওয়া যায়। তিনি সুযোগ পেলেই মহানবী (সা)-এর পরিবারের খেদমতে এগিয়ে যেতেন। মহানবী (সা)-এর জন্য কিভাবে কিছু করা যায় এ জন্য উসমান (রা) সবসময় উদগ্রীব হয়ে থাকতেন।

ব ল তে পা রো ?

১. মহানবী (সা) একবার কতদিন ধরে না খেয়ে উপবাস ছিলেন?

২. উসমান (রা) মহানবী (সা)-এর জন্য কী করেছিলেন?

৩. হযরত আলী (রা)-এর সম্বল বলতে কী কী ছিল?

দানবীর হযরত উসমান (রা)

হযরত উসমান (রা) তাঁর নরম স্বভাব ও সুন্দর ব্যবহারের জন্য বিশেষভাবে পরিচিত ছিলেন। তাঁর মনও ছিল সীমাহীন মাধুর্যে পরিপূর্ণ। তিনি আরব সমাজে এক অনন্য চরিত্রের মানুষ বলে সমাদৃত ছিলেন। মানুষের অভাব-অনটন ও দুঃখ-কষ্ট দেখলে তিনি কাতর হয়ে পড়তেন।

উসমান (রা) আরবের সবচেয়ে ধনাঢ্য ব্যক্তিদের অন্যতম ছিলেন। তবে তিনি এ ধন-সম্পদ তাঁর আরাম-আয়াশের কোনো কাজে ব্যবহার করতেন না। সব সম্পদ তিনি মানুষের কল্যাণে বিলিয়ে দিতেন। মানুষের অভাব-অনটন জানতে পারলে তিনি দু'হাত ভরে অর্থ সম্পদ ব্যয় করতেন। উসমান (রা) এসব কাজ করেই যেন আনন্দ পেতেন।

একবার এক জেহাদ থেকে ফিরে মুসলমানরা বেশ অসুবিধায় পড়ে গেলেন। জেহাদ থেকে ফিরে এসে তারা দেখলেন তাদের সংসারে চলছে বেশ টানাটানি। প্রচণ্ড অভাবের তাড়নায় তাদের পরিবারগুলো দিশেহারা হয়ে পড়ল।

তখন দেশজুড়ে চলছিল প্রচণ্ড দুর্ভিক্ষ। ফলে মুসলমানদের অনেকেই অনাহারে-অর্ধাহারে বেশ দুর্বল হয়ে পড়ল। মুসলিম পরিবারের ছোট ছোট ছেলেমেয়ে খেতে না পেরে কঙ্কালসার হয়ে পড়ছিল। চারদিকে চলছিল অভাবনীয় হাহাকার। অন্যদিকে মদীনার ইহুদি লোকেরা ছিল খুব অর্থশালী। তাদের না ছিল অভাব, না ছিল অনটন। বেশ আনন্দে-ফুর্তিতেই কাটছিল তাদের দিন। এ সময় মুসলমানদের দুর্দিনে তারা বেশ অহঙ্কারী হয়ে উঠল। মুসলমানদের দুঃখ-কষ্ট ও অভাব-অনটন দেখে তাদের মধ্যে খুশীর যেন বন্যা বয়ে গেল।

মুসলমানদের যেখানে অসহায় অবস্থা তখন ইহুদিরা ছিল বেশ খোশ মেজাজে। সুযোগ পেলেই তারা মুসলমানদের দেখে টিপ্পনি কাটত। এ ভয়াবহ পরিস্থিতি হযরত উসমান (রা)-কে বিচলিত করে তুলল। এতে তাঁর মন উতলা হয়ে উঠল। মুসলমানদের এ দুর্যোগ কিভাবে কাটানো যায়, তা নিয়ে ভাবতে গিয়ে উসমান (রা) অস্থির হয়ে পড়লেন। একদিন ঘটল এক ঘটনা। উসমান (রা) চৌদ্দটি উটের পিঠে খাদ্য-সামগ্রী বোঝাই করলেন। তারপর সেগুলো তিনি মহানবী (সা)-এর নিকট পাঠিয়ে দিলেন।

মহানবী (সা) এসব খাদ্য-সামগ্রী মুসলমানদের মধ্যে বিতরণ করে দিবেন- এটাই ছিল হযরত উসমান (রা)-এর উদ্দেশ্য। হযরত উসমান (রা)-এর এ বিশাল দান পেয়ে মহানবী (সা) খুব খুশি হলেন। তিনি এসব সম্পদ দুর্বল মুসলমানের মাঝে বিতরণ করে দিলেন। অসহায় মুসলমানরা এ দান পেয়ে আনন্দে আত্মহারা হলো। সবাই উসমান (রা)-এর জন্য প্রাণভরে দোয়া করলেন। সে সময় ইসলামী রাষ্ট্রের রাজধানী ছিল মদীনায়। মহানবী (সা)-এর কাছে অতি প্রিয় এ শহর। তবে মদীনা তখনও সেভাবে গড়ে ওঠেনি। মদীনায় খাবারের পানির তেমন কোনো ভালো ব্যবস্থা ছিল না। হাতে গোনা দু'একটি মাত্র কুয়ো ছিল মদীনা শহরে।

তাই খাবারের পানি নিয়ে টানাটানি লেগেই থাকত। তা ছাড়া সুন্দর শহর মদীনায় সুমিষ্ট পানির ব্যবস্থা মোটেও ভালো ছিল না। তবে মদীনায় এক ইহুদির মালিকানায় রুমা নামক একটি কুয়ো ছিল। সুমিষ্ট পানির জন্য রুমা কুয়োর বেশ নামডাক ছিল।

তাই এ কুপের প্রতি সবার ছিল প্রচণ্ড আকর্ষণ। তবে কুয়োর ইহুদি মালিক ভালো মানুষ ছিল না। সে ছিল চরম হিংসুটে। মুসলমানদের সে প্রচণ্ড ঘৃণা

করত। তাই সে কুয়ো থেকে মুসলমানদের পানি দিতে চাইত না। অথচ মদীনার ইহুদি বাসিন্দারা অনায়াসে রুমা কুয়োর পানি ব্যবহার করতে পারত। ইহুদির এ অমানবিক আচরণের কারণে মুসলমানরা বেশ দুরবস্থার মধ্যে পড়ে গেল। মুসলমানদের দুরবস্থার কথা হযরত উসমান (রা)-এর কানে গেল। এ খবর শুনে তিনি খুব দুঃখ পেলেন।

উসমান (রা) ছিলেন ধনী মানুষ। তাই তিনি ভাবলেন, ইহুদির কুয়োটা তিনি কিনে নেবেন এবং তা মুসলমানদের জন্য খুলে দেবেন। এতে যদি মুসলমানদের দুঃখ কষ্ট কিছুটা লাঘব হয়। তবে ইহুদি যে কুয়োটি সহজে বিক্রি করতে রাজি হবে না, তাও উসমান (রা) বুঝতে পারলেন। তাই প্রথমে তিনি অর্ধেক কুয়ো কিনে নেওয়ার প্রস্তাব দিলেন। উসমান (রা) এর জন্য ভালো দামও হাঁকালেন। ইহুদি লোকটি ছিল বেশ গরিব। তাই অর্থের অভাবে সে উসমান (রা)-এর প্রস্তাবে রাজি হয়ে গেল।

কিন্তু অর্ধেক কুয়ো কিনেও সমস্যার সমাধান হলো না। এর পানি বণ্টন ব্যবস্থা নিয়ে সমস্যা দেখা দিল। কেননা, কে কখন পানি নেবে– এটা ঠিক করা কঠিন হয়ে পড়ল। অনেক ভেবে-চিন্তে অবশেষে ইহুদি ও মুসলমানদের মধ্যে একটি আপস চুক্তি সম্পাদিত হলো। চুক্তি অনুযায়ী মুসলমানরা একদিন এবং ইহুদিরা অন্যদিন পালাক্রমে কুয়োর পানি ব্যবহার করতে সম্মত হলো। তবে ইহদিদের সাথে মুসলমানরা পেরে উঠল না। কেননা, তারা ছিল খুবই খারাপ লোক। তারা কখনও ভালো কিছু ভাবতে পারত না। আর মুসলমানদের ব্যাপার হলে তো কথাই নেই। বলা বাহুল্য, আজও ইহুদিদের এ স্বভাবের কোনো পরিবর্তন হয়নি।

বাস্তবে রুমা কুয়ো নিয়ে দেখা দিল প্রচণ্ড সমস্যা। দেখা গেল, ইহুদিরা নির্দিষ্ট দিনে রুমা কুয়ো থেকে বেশি পরিমাণ পানি নিয়ে নিত। ফলে পরের দিন পানির টানাটানি পড়ে যেত। তাই মুসলমানরা তেমন একটা পানি পেত না। এ কারণে মুসলমানদের পানির অভাব আর ঘুচল না। তাদের কষ্টের দিনও শেষ হলো না। উসমান (রা) দেখতে পেলেন পানির সমস্যা আর শেষ হচ্ছে না। ইহুদিদের চালাকির কারণে মুসলমানরা ঠিকমতো পানিও পাচ্ছে না। অথচ মুসলমানরা রীতিমতো কষ্ট করে যেতে লাগল। অনেক ভেবেচিন্তে উসমান (রা) ঠিক করলেন, এবার পুরো কুয়োটাই তিনি কিনে নেবেন। ইহুদি তাতে রাজি হলো না। তখন অবশ্য ইহুদি লোকটি

অর্থের বেশ টানাটানিতে ছিল। অন্যদিকে তার অর্থেরও খুব প্রয়োজন দেখা দিল। তাই উসমান (রা) কুয়ো কেনার জন্য উচ্চমূল্য প্রস্তাব করলেন।

ইহুদিও কম চালাক ছিল না। মুসলমানদের পুরো কুয়োটাই প্রয়োজন। তাই সেও এ সুযোগের ব্যবহার করতে চাইল। ফলে সুযোগ বুঝে ইহুদি কুয়ো বিক্রির জন্য অনেক বেশি মূল্য দাবি করল। উসমান (রা) কুয়োর দাম নিয়ে আর কিছুই ভাবতে চাইলেন না। ইহুদি যে অবশেষে পুরো কুয়ো বিক্রি করতে রাজি হয়েছে তাতেই উসমান (রা) যারপরনাই খুশি হলেন। তাই উসমান (রা) ইহুদির প্রস্তাবে রাজি হয়ে গেলেন। অবশেষে উসমান (রা) ইহুদির কাছ থেকে অধিক মূল্য দিয়ে পুরো কুয়োটাই কিনে নিলেন।

কুয়ো কিনে নেওয়ার পর উসমান (রা) মনে সীমাহীন শান্তি পেলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ কুয়োটা সবার জন্য খুলে দিলেন। মানুষ সুমিষ্ট পানি পেতে আর বেগ পেল না। এভাবেই দানবীর উসমান (রা) জনসেবায় তাঁর উদারতা প্রমাণ করলেন।

ব ল তে পা রো ?

১. মদীনায় একবার কিসের অভাব দেখা দিলো?

২. রুমা কুয়োর মালিক কে ছিল? এ কুয়োর পানি কেমন ছিল?

৩. উসমান (রা) পানির অভাব পূরণের জন্য কী ভাবলেন?

মানুষের জন্য ভালোবাসা

হযরত উসমান (রা)-এর সুন্দর মন সবার নজর কাড়ত। তাঁর বুক ভরা ছিল মানুষের জন্য প্রচণ্ড ভালোবাসা আর মনে ছিল সীমাহীন দরদ। মানুষ তাঁর এ অগাধ ভালোবাসায় মুগ্ধ হতো। কারো উপকার করতে পারলেই যেন উসমান (রা) মহাখুশি। তাঁর ছিল অঢেল অর্থ সম্পদ। কিন্তু এ সম্পদ মুসলমানদের উপকারের জন্যই সর্বদা নিয়োজিত থাকত।

উসমান (রা) সময়ের এক ঘটনা। হযরত আবু বকর (রা) ইসলামী খেলাফতের কর্ণধার হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। সে সময় দেশে দেখা দিল প্রচণ্ড দুর্ভিক্ষ। চারদিকে চলছিল খাবারের তীব্র অভাব। দেশজুড়ে তখন শুধু হাহাকার। মানুষ দুর্বল হয়ে পড়েছিল। অর্থশালীরাও কষ্টে দিনাতিপাত করছিল। কেননা, টাকা দিয়েও কোথায খাদ্য-সামগ্রী পাওয়া যাচ্ছিল না। কতদিন আর কষ্ট করা যায়!

হযরত উসমান (রা) ধনী ব্যবসায়ী। দেশের সেই অভাবের দিনে উসমান (রা)-এর ব্যবসার জন্য বিদেশ থেকে এক হাজার উট এলো। উটের পিঠে ছিল প্রচুর খাদ্য-সামগ্রী। এই বিশাল উটের কাফেলা সবার নজরে পড়ল।

তাই মানুষ উটগুলোকে ঘিরে ধরল। খাদ্য-সামগ্রী কেনার জন্য সবাই সেখানে গিয়ে জড়ো হলো এবং হুমড়ি খেয়ে পড়ল।

মদীনার অসৎ ব্যবসায়ীরা ছিল ওৎ পেতে। সুযোগ পেলেই এরা মানুষকে ঠকাত এবং দ্রব্যের উচ্চমূল্য নিয়ে মানুষের কষ্ট বাড়াত। উসমান (রা)-এর উটের কাফেলা এসব অসৎ ব্যবসায়ীদের চোখ এড়াল না। তাই তারা ছুটে গেল সেখানে। তারা খাদ্য সামগ্রীর সবগুলোই কিনে নেয়ার প্রস্তাব করল। যে কোনো মূল্যে পণ্য-সামগ্রী কিনে নিতে চায় ব্যবসায়ীরা। তাদের ইচ্ছা, এগুলো কিনে নিয়ে তারা গুদামজাত করবে। তারপর গরিব জনগণের কাছে খাদ্য সামগ্রীগুলো চড়া দামে বিক্রি করে প্রচুর মুনাফা লুটে নেবে। ব্যবসায়ীদের এ খারাপ উদ্দেশ্য হযরত উসমান (রা)-এর কানে গেল। তিনি ঘটনা শুনে বেশ বিচলিত হয়ে পড়লেন। তাই উসমান (রা) কাফেলার দ্রব্যসামগ্রীর একটা বিহিত ব্যবস্থা করার চিন্তা-ভাবনা করলেন। উসমান (রা) তাঁর লোকদের ডেকে আনলেন। তিনি তাদের বললেন, 'শুনলাম, ব্যবসায়ীরা দ্রব্যগুলো চড়া দামে কিনে নিয়ে মুসলমানদের ঠকাতে চায়। আমি এটা করতে দিতে পারি না। আমার বেশি মুনাফার দরকার নেই। মুসলমানরা না খেয়ে মরবে আর আমি ব্যবসা করে মুনাফা লুটব তা হতে পারে না। তাই আমি খাদ্য-সামগ্রীগুলো গরিব মুসলমানদের মাঝে বিলিয়ে দিতে চাই।'

যেই কথা সেই কাজ। উসমান (রা) খাদ্য সামগ্রীগুলো দুর্বল ও অসহায় মুসলমানদের মধ্যে বিলিয়ে দিলেন। এভাবেই তিনি জনগণের প্রতি পরম ভালোবাসা ও মমত্ববোধের এক বিস্ময়কর নজীর স্থাপন করলেন।

ব ল তে পা রো ?

১. কখন মদীনায় দুর্ভিক্ষ দেখা দিলো?

২. উটের কাফেলার পিঠে কী ছিল?

৩. অসৎ ব্যবসায়ীরা কী করতে চাইল?

৪. উসমান (রা) খাদ্যসামগ্রীগুলো কী করলেন?

উসমান (রা)-এর উদারতা

হযরত আবু বকর (রা)-এর খেলাফতের শেষ দিনকার এক ঘটনা। তিনি বুঝতে পারছিলেন তাঁর সময় যেন ক্রমেই ফুরিয়ে এসেছে। তিনি হয়তো আর বেশি দিন বাঁচবেন না। তাই খেলাফতের পরবর্তী খলিফা নির্বাচন নিয়ে তিনি ভাবনায় পড়ে গেলেন। তিনি ভাবলেন, একজন যোগ্য সাহাবীর ওপর খেলাফতের দায়িত্ব দিয়ে যেতে চান। এটা করতে পারলেই যেন তিনি আশ্বস্ত হন। হযরত উমর, উসমান ও আলী (রা)-এরা সবাই হযরত আবু বকর (রা)-এর সহকর্মী। খেলাফতের কাজ পরিচালনায় তাঁরা নানাভাবে দায়িত্ব পালন করছিলেন। এরা দীনদারী, দক্ষতা ও বিশ্বস্ততায় কোনোদিক দিয়েই কেউ কারো থেকে কম ছিলেন না। তারপরও হযরত আবু বকর (রা) খেলাফতের দায়িত্ব নিয়ে অনেকের সাথে পরামর্শ করলেন।

হযরত উসমান (রা) আবু বকর (রা)-এর ঘনিষ্ঠ বন্ধু। তিনি সময় সময় বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর মূল্যবান পরামর্শ নিয়ে থাকেন। তাই খলিফা নির্বাচনের ব্যাপারে তিনি উসমান (রা)-এর মতামত নিতে চাইলেন। উসমান (রা)-এর সাথে একদিন কথাও বলা হলো। তবে উসমান (রা)-এর মত গেল হযরত উমর (রা)-এর পক্ষে। খলিফা আরও অনেক সাহাবীর পরামর্শ নিলেন। বেশির ভাগ সাহাবী উমর (রা)-এর পক্ষে তাদের মতামত দিলেন।

কয়েকদিন পরের ঘটনা। হযরত আবু বকর (রা)-এর শরীর খারাপ হলো। তিনি গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়লেন। তাই তাঁর টেনশন বেড়ে গেল। খলিফা নির্বাচনের বিষয়টি আরও গভীরভাবে তাঁর মনে রেখাপাত করল। তিনি আর অপেক্ষা করতে চাইলেন না। আবু বকর (রা) ঠিক করলেন, খলিফা নিয়োগের ব্যাপারে একটি অসিয়তনামা লিখে যাবেন। অসিয়ত লেখার জন্য উপযুক্ত ব্যক্তির কথা ভাবা হলো। আবু বকর (রা) সবশেষে হযরত উসমান (রা)-কেই এ কাজের জন্য যথাযথ ব্যক্তি বলে মনে করলেন। হযরত উসমান (রা)-কে তাৎক্ষণিকভাবে ডেকে আনা হলো। আবু বকর

(রা) উসমান (রা)-কে বললেন, 'আপনি তো আমার শরীরের অবস্থা ভালো করেই জানেন। আমি শরীর নিয়ে আশঙ্কাবোধ করছি। তাই আমি চাই একজন উপযুক্ত ব্যক্তিকে খলিফা নিয়োগ করে যাব। এ জন্য আপনাকে ডেকেছি একটি অসিয়ত লেখার জন্য। আপনি রাজি হলে এ কাজটি শেষ করতে পারি।'
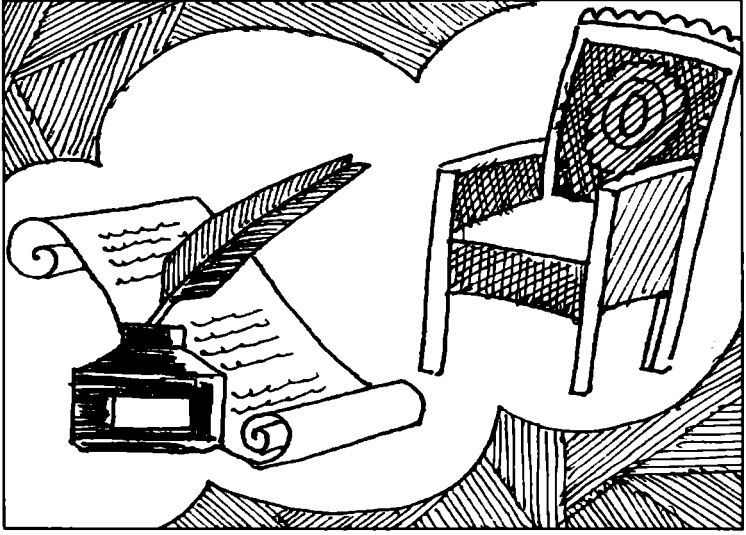
উসমান (রা) হযরত আবু বকর (রা)-এর কথা ফেলতে পারলেন না। তাই উসমান (রা) অনায়াসেই রাজি হয়ে গেলেন। একদিন দু'জন মিলে অসিয়ত লিখতে বসে গেলেন। হযরত আবু বকর (রা) অসিয়তের ভাষা বলে যাচ্ছেন আর উসমান (রা) তা লিখছেন। তবে কয়েকটি কথা লেখার পরপরই আবু বকর (রা) অজ্ঞান হয়ে পড়লেন। অজ্ঞান হবার পূর্ব মুহূর্তে আবু বকর (রা) বললেন, 'আমার মৃত্যুর পর আমি তোমাদের জন্য খলিফা হিসেবে---' এতটুকু বলেই তিনি জ্ঞান হারিয়ে ফেললেন।

হযরত আবু বকর (রা)-এর এ অজ্ঞান অবস্থায় উসমান (রা) ঘাবড়ে গেলেন। তিনি ভীষণ চিন্তায় পড়ে গেলেন। তাঁর আশঙ্কা জাগল আবু বকর (রা)-এর জীবন নিয়ে। খোদা না করুন, খলিফার জ্ঞান যদি আর ফিরে না আসে! এতে তাঁর অসম্পূর্ণ অসিয়ত নিয়ে ভবিষ্যতে হয়তো বিভ্রান্তির সৃষ্টি হতে পারে।

এ বিষয়ে অনেক ভেবেচিন্তে উসমান (রা) খলিফা আবু বকর (রা)-এর কথার বাকি অংশটুকু নিজে থেকেই লিখে রাখার সিদ্ধান্ত নিলেন। তিনি বাকিটুকু লিখলেন, '---উমরকেই নির্বাচিত করে যেতে চাই।'

আল্লাহর কী শান! খানিকক্ষণ পর হযরত আবু বকর (রা) জ্ঞান ফিরে পেলেন। জ্ঞান ফিরে পেয়েই তিনি আবার বিচলিত হয়ে পড়লেন। তিনি অসিয়তের কথা ভুললেন না। তাই উসমান (রা)-কে অসিয়তটি পড়ে শোনাতে বললেন। উসমান (রা) আবু বকর (রা)-এর অনুরোধ শুনে চমকে উঠলেন। কেননা, তিনি যে নিজে থেকেই অসিয়ত লেখা সম্পূর্ণ করে ফেলেছেন। তাই ভয়ে ভয়ে তিনি পড়ে শোনালেন, 'আমার মৃত্যুর পর আমি তোমাদের জন্য খলিফা হিসেবে উমরকেই নির্বাচিত করে যেতে চাই।' খলিফা আবু বকর (রা) অসিয়তটি শুনে কিছুটা নড়েচড়ে উঠলেন। তিনি বুঝতে পারলেন, অসিয়তের শেষ অংশটি তিনি নিজে থেকে বলেননি। এটা উসমান (রা) হয়তো নিজেই লিখে নিয়েছেন।

এতে খলিফা আবু বকর (রা) মোটেও অবাক হলেন না। কেননা, তিনি যার নাম লেখার মনস্থ করেছিলেন, হযরত উসমান (রা) ঠিক তাই লিখেছেন। হযরত আবু বকর (রা) উসমান (রা)-এর কাজে যারপরনাই মুগ্ধ হলেন।

আবু বকর (রা) লক্ষ করলেন, উসমান (রা) সুযোগ পেয়েও অসিয়তে তাঁর নিজের নাম নতুন খলিফা হিসেবে প্রস্তাব করেননি। তা না করে তিনি উমর (রা)-এর নাম অসিয়তে লিখেছেন। তিনি ইচ্ছা করলে অসিয়তে নিজের নামও লিখতে পারতেন। অথচ উসমান (রা) সে সুযোগ নেননি। এটা থেকে বুঝতে পারা যায়, হযরত উসমান (রা) কত বড় উদার ও মহৎ মানুষ ছিলেন।

ব ল তে পা রো ?

১. আবু বকর (রা) খলিফা নির্বাচনের ব্যাপারে ব্যাকুল হলেন কেন?
২. তিনি এ ব্যাপারে কী পন্থা অবলম্বন করলেন?
৩. অসিয়ত লেখার দায়িত্ব কে পালন করলেন?
৪. অসিয়ত লিখতে গিয়ে মাঝে কী সমস্যা হয়েছিল?
৫. আবু বকর (রা) উসমান (রা)-এর ওপর খুশি হলেন কেন?

পরিখার লড়াই ও হযরত উসমান (রা)

আরবে মুসলমানদের অসংখ্য শত্রু ছিল। তারা সবসময় মুসলমানদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করত। সুযোগ পেলেই তারা ইসলামকে নিঃশেষ করতে চাইত। মুসলমানদের নির্মূল করতে তারা সব চেষ্টাই চালাত না।

এবার বহুদিন পর তারা মুসলিম বিনাশে যৌথভাবে কাজ করার জন্য জোট বাঁধল। এ জন্য কুরাইশ, ইহুদি ও উপজাতি গোত্রের ইসলামবিরোধী নেতারা সবাই একত্র হলো। সবাই মিলে মুসলমানদের শেষ করতে মহা প্রস্তুতির কথা ভাবছিল। একদিন তারা দীর্ঘ সময় ধরে ষড়যন্ত্রের নানা কৌশল নিয়ে শলা-পরামর্শ করল। সকলে একমত হলো যে, এবার বড় একটা হামলা চালাতে হবে। নির্মূল করতে হবে মদীনার মুসলমানদের। সবার একটাই কথা, মুসলমানদের আর সময় দেয়া যাবে না।
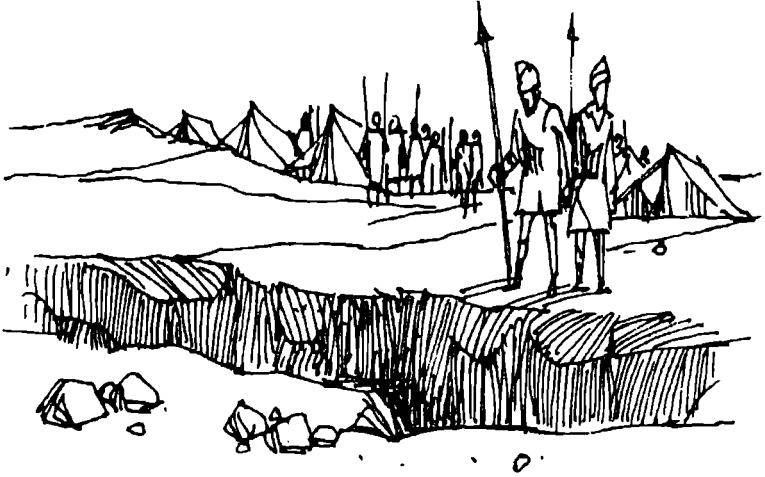
আবু সুফিয়ান ইসলামের বড় শত্রু বলে পরিচিত। তার মনে ছিল প্রচণ্ড ইসলামবিদ্বেষ। সে মুসলমানদের খুব ঘৃণা করত। ওহুদের যুদ্ধে হাতের মুঠোয় পেয়েও রাসূলুল্লাহ (সা)-কে সে ঘায়েল করতে পারেনি। তাই তার

মনে জমে ছিল প্রচণ্ড ক্ষোভ। আবু সুফিয়ান ভাবল, এবার বড় সুযোগ। মুসলমানদের এবার ছেড়ে দেবে না সে।

মদীনাবাসীদের ওপর কুরাইশরা বহুবার হামলা চালিয়েছে। তবে কোনমতেই তাদের কাবু করতে পারছিল না। এবার সব গোত্রকে একত্রে পেয়ে আবু সুফিয়ান খুব খুশি হলো। সে নিজের মতো করে সাজাল দশ হাজার সৈন্যের বিশাল বাহিনী। বেছে বেছে লোক নিল সেনাদলে। মনে মনে বলল–'এবার কোথায় যাবে বাছাধন? এবার কে রক্ষা করবে তোমাকে?' দশ হাজার দুশমনের বাহিনী শেষমেশ মদীনার উদ্দেশে যাত্রা শুরু করল। মুহূর্তের মধ্যে মদীনায় ছড়িয়ে পড়ল এ খবর। তাই মদীনার সর্বত্র সতর্কতা বিরাজ করছিল। মহানবী (সা)-এর কাছে গিয়েও পৌঁছল এ সংবাদ। তিনিও বসে থাকতে পারলেন না। তাই শত্রুদের মোকাবেলার কথা ভাবলেন। এ জন্য সম্ভব সব রকমের প্রস্তুতিও নিয়ে নিলেন।

যুদ্ধের জন্য মুসলমানদের জড়ো করা হলো। তবে মুসলিম সৈন্যসংখ্যা ছিল মাত্র তিন হাজার। কী করা যায় এখন? কিভাবে কাফেরদের এ বিশাল বাহিনীর মোকাবেলা করা যাবে? এ জন্য মহানবী (সা) সাহাবীদের এক পরামর্শ সভা ডাকলেন। সভায় সিদ্ধান্ত হলো, দুশমনরা আসার আগেই মদীনার তিনদিকে পরিখা খনন করে ফেলতে হবে। যাতে তারা এসে সুবিধা করতে না পারে। আর মদীনার একদিকে সুউচ্চ পাহাড় তো আছেই। সেদিক দিয়ে হামলা করে শত্রুরা তেমন সুবিধা করতে পারবে না। তাই মদীনার তিনদিকে পরিখা খনন করে ওদের হামলা রুখতে হবে।

মহানবী (সা) নিজেই পরিখা খননের কাজে নেমে পড়লেন। তাঁর সাথে অন্যসব সাহাবীও খননের কাজে লেগে গেলেন। হযরত আবু বকর (রা), হযরত উমর (রা), হযরত আলী (রা) কেউই কাজ থেকে পড়লেন না। সকলে নেমে গেলেন পরিখা খননের কাজে। হযরত উসমান (রা) তো বড় সওদাগর। তিনি এসব কাজে বরাবরই অর্থের জোগান দিয়ে থাকেন। রসদেরও যোগান দেন তিনি। যোগান দেন যুদ্ধাস্ত্র আর তেজি ঘোড়া।

কিন্তু এবারের যুদ্ধ তো অন্য রকমের। শত্রুদের আক্রমণ ঠেকাতে হলে পরিখা খননই হবে সবচেয়ে বড় বুদ্ধিমানের কাজ। হযরত উসমান (রা) ঠিক করলেন, তিনিও পরিখা খননের কাজে অংশ নেবেন। এতে পরিখা খননের কাজ আরো অনেক দ্রুত এগিয়ে যাবে। সবার সাথে তাই উসমান

(রা)ও কাজে লেগে গেলেন। কুরাইশরা যুদ্ধের ময়দানের কাছে আসার বহু আগেই ওহোদ প্রান্তরে পরিখা তৈরি হয়ে গেল। এদিকে কুরাইশরা মদীনার কাছাকাছি পৌঁছে বিস্মিত হলো। ওহুদের তিনদিক থেকে পরিখার কারণে তারা এগুতে পারল না। তাই তারা পরিখার ওপারেই তাঁবু গাড়ল। শত্রুরা কোনমতেই পরিখা ডিঙিয়ে সামনে আসতে পারল না। এভাবে পুরো একমাস কেটে গেল।

এবার শত্রুদের মাথায় এক জেদ চেপে বসল। যে কোনোভাবেই হোক তারা পরিখা অতিক্রম করার সিদ্ধান্ত নিল। ওদের কথা, ওরা মদীনায় ঢুকবেই। মদীনার সমস্ত মানুষকে খতম করে তবেই ওরা ঘরে ফিরবে।

কিন্তু আল্লাহতাআলা তাদের এ অন্যায় জেদ ধুলোয় মিশিয়ে দিলেন। একদিন শত্রু নেতারা সবাই তাদের শিবিরে বসে নতুন এক ফন্দি আঁটছিল। কিন্তু দুশমনরা সবাই যখন বৈঠক করছিল ঠিক তখন আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে নেমে এলো ভীষণ ঝড়। সে ঝড়-তুফানের তাণ্ডবে লণ্ডভণ্ড হয়ে গেল শত্রুদের সমস্ত খাবার-দাবার। চোখের পলকেই ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল ওদের সেই বিশাল সেনাবাহিনী। তেজি তেজি সকল যোদ্ধা পর্যন্ত প্রাণভয়ে মক্কার দিকে পালাতে লাগল। দুশমনদের সর্দার আবু সুফিয়ানও রণে ভঙ্গ দিয়ে মক্কায় ফিরে গেল।

ব ল তে পা রো ?

১. পরিখা কী? কোথায় পরিখা নির্মাণ করা হয়েছিল?

২. পরিখা নির্মাণে কারা অংশ নিলেন? কাফের সেনাপতি কে ছিল?

৩. ঝড়-তুফানে শত্রু শিবিরের কী অবস্থা হয়েছিল?

৪. অবশেষে শত্রুদের কী অবস্থা হলো?

মহান দাতা উসমান (রা)

ইসলামের নবী হযরত মুহাম্মদ (সা) ছিলেন মানবতার নবী। অভাবী ও দরিদ্র মানুষের প্রতি তাঁর ছিল অসম্ভব মমত্ববোধ ও ভালোবাসা। সর্বোচ্চ সবকিছু দিয়ে তিনি তাদের সহায়তা করতেন।
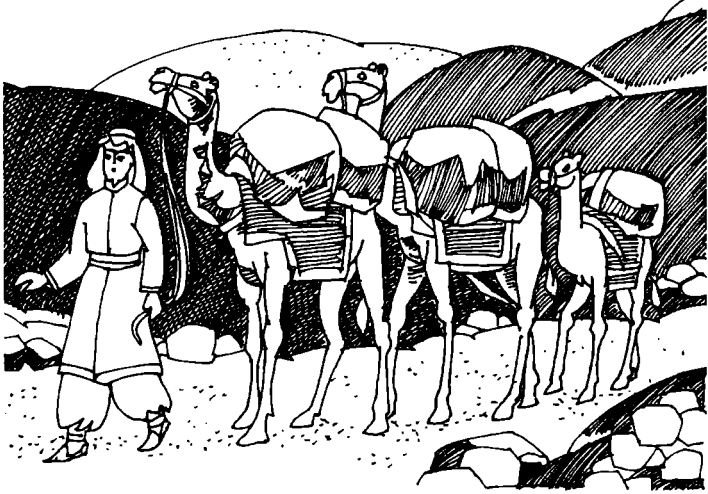
মহানবী (সা) নিজেও অভাব-অনটনের মধ্যে কাটাতেন। তারপরও তাঁর কাছে কোনো লোক এলে তিনি তাকে আদর করে বসাতেন। তার বাড়ি-ঘরের খোঁজ-খবর জিজ্ঞেস করতেন। তার সুখ-দুঃখের কথা জানতে চাইতেন। রুজি-রোজগারের খোঁজ-খবরও নিতে তিনি ভুলতেন না। দুঃস্থ ও অভাবী লোক হলে তো কথাই নেই। তাকে যথাসাধ্য সাহায্য করতে মহানবী (সা) ভুল করতেন না। কিন্তু সব দিন তো আর সমান যায় না! কোনো কোনো দিন নবী কারীম (সা)-এর ঘরে একটি গমের দানাও থাকত না। এমনও হতো যে, তিনি নিজেই পরিবার-পরিজন নিয়ে হয়তো না খেয়ে আছেন। তবে তখনও যদি কেউ তাঁর কাছে এসে হাত পাতত, তিনি তার উপকার করতে প্রাণপণ চেষ্টা করতেন।

একদিনের এ রকম এক ঘটনা। অভাব-অনটনে জর্জরিত এক অপরিচিত লোক এসে মহানবী (সা)-এর কাছে সাহায্য চাইল। মহানবী (সা) দেখলেন, লোকটি সত্যি সত্যিই অভাবী। তাই তাকে সাহায্য দেয়া দরকার। কিন্তু কী করবেন তিনি? আজ তাঁর ঘরেও যে খাবারের মতো কিছু নেই। তা হলে লোকটিকে সাহায্য দেবেন কিভাবে? অনেক ভেবে-চিন্তে লোকটিকে তিনি হযরত উসমান (রা)-এর কাছে যেতে পরামর্শ দিলেন। উসমানের কাছে যেতে বলায় লোকটি মহানবী (সা)-এর ওপর মোটেও খুশি হলো না, বরং সে বেশ হতাশই হলো। তাই সে মনে মনে বলল, 'রাসূলুল্লাহ (সা) যদি কিছু সাহায্য করতে না পারেন ভালো কথা, তবে এর কাছে যেতে বলছেন কেন? উসমান (রা) তো ভালো খাবার-দাবার পর্যন্ত খান না। ভালো কাপড়-চোপড় পরিধান করেন না। ও রকম লোকের কাছে বুঝি সাহায্যের জন্যে যাওয়া যায়?'

অভাবী লোকটি মনে মনে এ রকম কথা ভাবছিল আর পথ চলছিল। তারপরও সে মনে বলল, স্বয়ং রাসূল (সা) তাকে যেতে বলেছেন, না গেলেও, তো খারাপ দেখায়। তাই অনিচ্ছা সত্ত্বেও সে হযরত উসমান (রা)-এর বাড়ির দিকে পা বাড়াল। নানান কথা ভাবতে ভাবতে এক সময় লোকটি উসমান (রা)-এর বাড়ির সামনে গিয়ে হাযির হলো। তখন ওখানটায় নেমেছিল রাতের গাঢ় অন্ধকার। লোকটি দেখতে পেল হযরত উসমান (রা)-এর এত বড় ঘরটি প্রায়ই অন্ধকারে ডুবে আছে। একটি কামরায় টিমটিমে একটি বাতি জ্বলছিল মাত্র। উসমান (রা)-এর বাড়ির এ অবস্থা দেখে লোকটি আরো হতাশ হয়ে পড়ল। সে ভাবল, যিনি পয়সা বাঁচানোর জন্য এত বড় বাড়িতে মাত্র একটি বাতি জ্বালাচ্ছেন তাঁর কাছে সাহায্য চেয়ে কোনো লাভ হবে না।

তাই লোকটি আর সামনের দিকে এগুলো না। উসমান (রা)-এর সাথে দেখা না করে লোকটি নিরাশ হয়ে তার বাড়ির দিকে ফিরে গেল। পরের দিন লোকটি আবার রাসূল (সা)-এর কাছে গিয়ে ধর্না দিল। সে তার দুর্দশার কথা মহানবী (সা)-কে ফের খুলে বলল। রাসূলুল্লাহ (সা) লোকটিকে দেখে অবাক হলেন। তিনি তাকে উসমান (রা)-এর কাছে পাঠিয়েছেন, অথচ সে আবার এখানে এসে হাত পাতছে। ব্যাপার কী?

জানতে চাইলেন আল্লাহর মহানবী (সা)। লোকটি জবাব দিল : জনাব আমি আপনার নির্দেশ মতো উসমান (রা)-এর বাড়ি পর্যন্ত গিয়েছি। উসমান (রা) ধনী সওদাগর বটে, কিন্তু তিনি তো নিজেই কোনো কিছু খরচ করেন না। তাঁর কাছে সাহায্য চাইব কিভাবে?

রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন : আচ্ছা বুঝলাম, ভাই। তোমার কথা ঠিকই আছে। তুমি কী তাঁর সামনে গিয়ে কিছু চেয়েছিলে?

লোকটি হতাশার সুরে জবাব দিল : না, মহানবী (সা) না, আমি তার কাছেও যাইনি এবং কিছু চাইনি। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন : কেন চাওনি? কারণ খুলে বলবে কী?

লোকটি জবাব দিল : আমি যখন উসমান (রা)-এর বাড়ির সামনে যাই তখন চারদিকে ছিল রাতের গাঢ় অন্ধকার। কিন্তু তাঁর এতবড় বাড়িতে মাত্র একটি টিমটিমে বাতি জ্বলছিল। বলুন, যিনি তেল খরচ করতে এত ভয় পান, তাঁর কাছে চেয়ে কি কিছু পাওয়া যাবে? এটা ভেবে আমি উসমান (রা)-এর কাছে কিছু চাইতে যাইনি।' লোকটির কথা শুনে রাসূলুল্লাহ (সা) মুচকি হাসলেন। তারপর তিনি বললেন : তোমার সব কথাই শুনলাম। এটা তোমার স্রেফ অনুমান। আমি বলি, তুমি উসমান (রা)-এর কাছে আবার যাও। তাঁকে গিয়ে বুঝিয়ে বলো। আশা করি তোমার কাজ হবে।'

এবার রাসূলুল্লাহ (সা)-এর লোকটি আর ফেলতে পারল না। তাই সে হযরত উসমান (রা)-এর বাড়ির দিকে রওয়ানা দিল। কিন্তু ভাগ্যক্রমে পথেই হযরত উসমান (রা)-এর সাথে তার দেখা হয়ে গেল। সে হযরত উসমান (রা)-কে তার দুঃখের সব কথা খুলে বলল।

লোকটির দুঃখের কথা শুনে হযরত উসমান (রা)-এর মন কেঁদে উঠল। তিনি লোকটিকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন–'তুমি একটু অপেক্ষা কর। কিছুক্ষণের মধ্যেই আমার সওদা নিয়ে একটি কাফেলা এখানে আসবে। সেখান থেকে বেশি বোঝাওয়ালা উটটি তুমি নিয়ে যেয়ো।'

সত্যি সত্যিই কিছুক্ষণ পর উটের এক কাফেলা সেখানে এসে হাজির হলো। সবচেয়ে বেশি বোঝাওয়ালা উটটি ছিল সবার সামনে। হযরত উসমান (রা) সে উটটির রশি অভাবী লোকটির হাতে তুলে দিলেন।

লোকটি উটের রশি ধরে তার বাড়ির দিকে ফিরে চলল। সাথে সাথে পেছনের উটগুলোও আগের উটটির পিছু নিল। হযরত উসমান (রা)

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলেন তার পুরো কাফেলাটাই লোকটির পিছু পিছু চলে যাচ্ছে। লোকটি অবাক হয়ে দেখল সে অভাবিত দৃশ্য। দেখতে দেখতে উটের পুরো কাফেলা একসময় লোকটির সাথী হয়ে দূরে মিলিয়ে গেল।

হযরত উসমান (রা) তৃপ্তিভরে দেখলেন এই দৃশ্য। তারপর বুকভরা শান্তি নিয়ে তিনি বাড়ির দিকে পা বাড়ালেন। উসমান (রা)-এর দানের এরকম নজির সত্যিই বিরল।

ব ল তে পা রো ?

১. মহানবী (সা)-এর কাছে কেউ সাহায্য চাইলে তিনি কী করতেন?

২. একদিন একটি লোককে তিনি কার কাছে পাঠালেন?

৩. লোকটি উসমান (রা)-এর বাড়ির কাছ থেকে ফিরে এলো কেন?

৪. রাসুল (সা) লোকটিকে ফের কী পরামর্শ দিলেন?

৫. উসমান (রা) লোকটিকে কিভাবে সাহায্য করলেন?
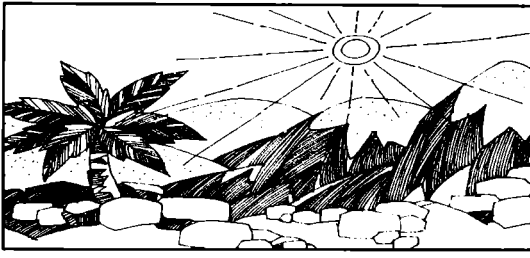
এক নজরে উসমান (রা)

৫৭৬ খ্রিস্টাব্দ : আরবের বিখ্যাত কুরাইশ বংশের উমাইয়া গোত্রে উসমান (রা) জন্মগ্রহণ করেন।

৬১০ খ্রিস্টাব্দ : হযরত উসমান (রা) ইসলাম গ্রহণ করেন। তাঁর ইসলাম গ্রহণ নিয়ে নানা ধরনের তথ্য পাওয়া যায়।

৬২৫ খ্রিস্টাব্দ : ওহোদ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এ যুদ্ধে উসমান (রা) রাসূল (সা)-এর নিরাপত্তার দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন।

৬২৭ খ্রিস্টাব্দ : খন্দকের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। যুদ্ধের আগে তিনদিকে পরিখা খনন করা হয়। হযরত উসমান (রা)ও পরিখা খননের কাজে অংশ নেন।

৬৪৪ খ্রিস্টাব্দ : খলিফা হযরত উমর (রা)-এর ইন্তেকাল করেন। তারপর হযরত উসমান (রা) খলিফা নির্বাচিত হন।

৬৪৫ খ্রিস্টাব্দ : খলিফার নির্দেশে মুসলিম বাহিনী মিসরের আলেকজান্দ্রিয়া দখল করে নেয়।

৬৪৭ খ্রিস্টাব্দ : রোমানদের সাথে আমীর মুয়াবিয়ার নেতৃত্বে মুসলমানদের লড়াই সংঘটিত হয়। মুসলমানরা আরমেনিয়া ও তাজিকিস্তান দখল করে নেয়।

৬৫১ খ্রিস্টাব্দ : পারস্য সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালিত হয়। মুসলমান সেনারা কিরমান, মাকরান, সিজিস্তান, হিরাট, কাবুল, গজনী দখল করে নেয়।

৬৫৬ খ্রিস্টাব্দ : ১৮ জিলহজ 'তুজিবী' নামক ঘাতকের হাতে হযরত উসমান (রা) শাহাদাতবরণ করেন। তখন উসমান (রা) আল-কুরআন তেলোয়াত করছিলেন।